KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮, সর্বাঙ্গ মাজুমদার লেন, কলকাতা-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিরব (BIRAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 1/1 1/2-3 1/4 2/1	Year of Publication : July - Sep 1976 Jan - March 1977 Apr - Jun 1977 July - Sep 1977
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সঞ্জীব বক্সী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

১

বিভাব

সম্পাদক/মণীশ নন্দী

বিভাব

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ
সিগারেট খাওয়া
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING
IS INJURIOUS TO HEALTH

WVF-6368-1R

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

বিভাব

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

শারদীয় সংখ্যা

১৩৮৩

প্রবন্ধ

মার্কসিজমের গোরস্থান : রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প । নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১৭

বাউল সঙ্গীতে মানুষ । প্রদীপ ভট্টাচার্য ৩৫

কবিতাগুচ্ছ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা । প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৪০

একগুচ্ছ নতুন কবিতা । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৪

পুনর্বিবেচনা

অক্ষয়কুমার বড়াল । আলোক সরকার ৫১

শিল্পভাবনা

সিনেমার দুই ধারা । মৃগাঙ্কশেখর রায় ৬১

বাণিজ্যচিন্তা

উৎপাদন উৎপাদন । মণীশ নন্দী ৭০

কবিতাগুচ্ছ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা । প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৪

একগুচ্ছ নতুন কবিতা । বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ৭৮

বিভাব

পুরাতনী

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রণ ও আলোচনা । বিনয় ঘোষ ৮৪

আলোচনা

ফ্রিডম এ্যাট্ মিডনাইট । নৃপেন্দ্র সান্যাল ৯৪

আওয়ার ফিল্ম, দেয়ার ফিল্ম । সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০

সাময়িকপ্রসঙ্গ

মাও সে তুং । সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১০৭

কাজী নজরুল ইসলাম । আরতি সেন ১১১

সম্পাদক

মণীশ নন্দী

সম্পাদকমণ্ডলী : পবিত্র সরকার। বিকাশ নন্দী। কবিরুল ইসলাম।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৫/১ সি, ওল্ড বালীগঞ্জ রোড। কলিকাতা—৭০০০১৯

প্রচ্ছদ : শ্রীশঙ্কর ঘোষ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা—৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং রাজধানী প্রিন্টিং, ১১৭/১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত।

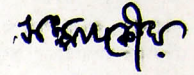

বিভাব প্রকাশিত হলো। কেন আরো একটি নতুন পত্রিকা? এক কথায় এর উত্তর হয় না, আমরা তাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্পর্কে বিশদ না হয়ে পাঠককে সংখ্যাটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করবো। মনে হয় মনস্ক পাঠকের কাছে এর বৈশিষ্ট্য প্রথম সংখ্যা থেকেই ধরা পড়বে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি বিন্দু থেকে আমাদের সুরু করতে হয়। প্রাণস্পন্দনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমরা একটি পরিণতির দিকে এগুই; শৈশব পর্যবসিত হয় বার্ধক্যে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি প্রবহমান বসন্তকালই আমাদের কাম্য। ফুল ফুটুক, শিকড় ক্রমশই গভীরসঞ্চারী হোক, কিন্তু শুকনো পাতাদের এখুনি পুড়িয়ে ফেলা উচিত। উচিত প্রতিষ্ঠানবিনীত সাহিত্যের গোত্রনাশ করা।

শিল্পী তাঁর তুলি সঞ্চালনের মধ্যে মাঝে মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে তার উৎস অর্থাৎ মডেল রমনীটির দিকে তাকান, পরমুহূর্তেই আবার গড়ে উঠতে থাকা ব্যক্তি-অনিরপেক্ষ রেখার কাছে ফিরে যান, বুঝতে চান তাঁর রঙ কতটা শিল্প হয়ে উঠছে। আমাদেরও বোধ হয় মাঝে মাঝে ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের সমস্ত সুন্দর সার্থক প্রাক্তন সাহিত্যকর্মের কাছে; না হলে সুরুর বিন্দু থেকে কতদূর আমাদের প্রগতি, অথবা সত্যিই আমরা এগুচ্ছি

কিনা, বুঝবো কি করে? আমরা তাই প্রতি ঋতুর নতুন পুষ্পসম্ভারের সঙ্গে সাহিত্যবৃক্ষটির শিকড়ের দিকেও সমান দৃষ্টি রাখবো।

'বিভাব' শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদ্দীপনা। অনুভাব ও চিত্তের ঐকাগ্র অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত। আমাদের উদ্দীপনা আছে, একাগ্রতারও অভাব ঘটবেনা। ভালো লেখা ও সহৃদয় পাঠকের আনুকূল্য পেলে আমরা অচিরেই বিভাবকে বাংলাভাষার অন্যতম আকর্ষণীয় সাহিত্যপত্র করে তুলতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস। এতে সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও বর্তমান সময়ের সঙ্গে সংস্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপরও রচনা প্রকাশিত হবে।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মাও সে তুং পরলোক গমন করেছেন। এই শতাব্দীতে একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কারো সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিত্বের তুলনা চলেনা। তাঁর মত ও পন্থার সঙ্গে হয়তো আমাদের অমিল ছিল কিন্তু যিনি একাই পৃথিবীর বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে নেশা ও সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্ত করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন তার অনন্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

কবি নজরুলও আমাদের মধ্যে নেই। বাংলার জাতীয় ও রাজনৈতিক দুর্দিনে এই নির্ভীক কবি যুবমানসে প্রার্থনীয় স্ফুলিংগটি সংযোগ করেছিলেন। কবিতায়, গানে, একদার এই প্রেমিক, কাপালিক, বিদ্রোহী কবির মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। মৃত্যু স্বাভাবিক, কিন্তু নজরুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষমার অযোগ্য ব্যবহার আমাদের স্তব্ধ করে রাখে।

মাও সে তুং ও নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনসহ দুটি রচনা এ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'লো।

শেষ করার আগে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্যকে। তার সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের উৎসাহিত করেছে। শ্রীসূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতপ্রণোদিত অকুণ্ঠ সাহায্যের কথাও আমাদের মনে থাকবে। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও শঙ্কর ঘোষ এই সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন, তাকেও ধন্যবাদ। বিভাবের আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

প্রবন্ধ

মার্কসিজমের গোরস্থান ঃ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ?

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

১। সেদিন কোন এক বাংলা কাগজে দেখা গেল, আমরা এখানকার কবিরা যদিও রাশিয়ান নই তবুও আমাদের কবিতারও শ্রেণীবিচার হচ্ছে সোভিয়েট আদর্শে; ভাবের দিকে সে রচনা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে নয়। জাতের দিকে সে বুর্জোয়া কি প্রলেটারিয়েট এই নিয়ে। আমাদের সন্তোষ এককালে কতকগুলি সাঁওতালি গান সংগ্রহ করেছিল, জানি নে সে গান বুর্জোয়া কি প্রলেটারিয়েট। না জেনেও তার মধ্যে কোনো কোনো গান খুব ভালো লেগেছিল। তার থেকে প্রমাণ হবে কি যে সেগুলি বুর্জোয়া। যখন ময়মনসিংহগীতিকা হাতে পড়ল খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। শ্রেণী-ওয়ালাদের মতে এসব কবিতা হয়তো বা প্রলেটারিয়েট। কিন্তু আমি তো জাত-বুর্জোয়া, আমার ভালো লাগতে একটুও বাধে নি। ভাঁটার দিনে যখন উপরকার প্রবাহের প্রবল ঐশ্বর্যের চেয়ে তলাকার নুড়ি পাথর পাঁকের প্রাধান্য জোর পেয়ে ওঠে তখন প্রলেটারিয়েট নুড়ি বালির আদর্শেই কি নদীর শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করতে হবে। মনুষ্যত্বের আদর্শের চেয়ে জন্মগত শ্রেণীগত আকস্মিকতা বেশি অভ্যর্থনা পায় সমাজের দুর্দিনে।...আমি বুঝতে

পারি এর আন্তরিক কারণটা। নতুন যুগে সাহিত্য আপন রচনায় আপন কালের বিশেষ সাক্ষ্য দেবে, সময়ের এই দাবিটা মনকে চঞ্চল করেছে। যুগে যুগে গুটি কেটে বেরোয় সাহিত্যের প্রজাপতি, বাণীর ডানায় নূতন রঙের ছোপ লাগিয়ে। কিন্তু সেটা লাগে সহজে প্রাণ ধর্মের তাগিদে।··· ইতিমধ্যে সাহিত্যের প্রলেটারিয়েট বুর্জোয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের ছাপ মারবার যে অদ্ভুত উত্তেজনা আমাদের দেশে দেখা গেল সেও ঐ একই উত্তেজনার অঙ্গীভূত। সাহিত্যে এ-রকম শ্রেণীভেদ অত্যন্ত নূতন সন্দেহ নেই, কেননা অত্যন্ত অসংগত।···সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না তা বলি নে, কিন্তু সে যদি ফৌজদারি মামলা চালাবার মোক্তারি করতে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় তাহলে দেশ-বিদেশের সাহিত্যে মড়ক লাগবে যে।···এখন তো কর্তাদের আমলে আমার রচনা এখানে ওখানে মুসলমানি ছুরির খোঁচা খায়, তার নাকের সামনে তর্জনীও ওঠে। তখন মার্কসিজমের কোন্ গোরস্থান সামনে আছে?

(অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ১৭ ৩/৩৯)

২। ···অথচ এও জানি সমাজের বাইরে একটা পারিবারিক দ্বীপের নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমার জন্মদেশের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলুম, সেই বিচ্ছেদের সমুদ্র পেরিয়ে দেশের শস্যক্ষেত থেকে আমি ফসল আনতে পারিনি। নিজের খাদ্য আমার নিজেকে একলা জন্মাতে হয়েছে, তার জাত আলাদা। দেশকে আমি যতই ভালোবাসিনে কেন, অনিবার্য কারণে আমার মন তবু আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সেইজন্যে এখানকার বাজারে সাহিত্য যাচনদার প্রবীণ মুরুব্বি যখন আমার লেখায় শ্রেণী নির্ণয় করতে বসে আমার অনেক সময় হাসি পায়। আমি যে জন্মব্রাত্য, শিশুকাল থেকেই আমি শ্রেণীভ্রষ্ট, এমন কি ব্রাহ্মসমাজও আমাকে খুঁটিতে বাঁধতে পারেনি।···

(অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি, ২৫/৪/৩৪)

3. Being a landlord I had to go to villages and then I came in touch with the village people and their simple modes of life...At first I was quite unfamiliar with the village life as I was born and brought up in Calcutta and so there was

an element of mystery for me...My earlier stories have this background and they describe this contact of mine with the village people. They have the freshness of youth. Before I had written these short stories there was not anything of that type in Bengali literature...My later stories have not got that freshness, though they have greater psychological value and they deal with problems. Happily I had no social or political problems before my mind when I was quite young ...During my youth whatever I saw appealed to me with pathos quite strong and therefore, my earlier stories have a greater literary value because of their spontaneity. But now it is different. My stories have got the necessary technique but I wish I could go back once more to my former life.

(**Forword**, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ)

৪। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব-নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্যবিচারে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করছে। এরই ফলে কুমু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমু কি না এই সাহিত্যসংগত প্রশ্নটা কারো কারো লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কুমু মানবসমাজে নারী-নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পারছে কি না—অর্থাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কি না। মানবপ্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ মনোবিজ্ঞানের। আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ সাহিত্যের। অবশ্য, এ কথা বলাই বাহুল্য, নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী ক'রে আঁকা পাগলামি। বস্তুত, সে কথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় তো সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু বলেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি বলে নয়।

(সাহিত্যবিচার, 'সাহিত্যের পথে', ১৩৩৬)

৫। মূলকথা হচ্ছে যে, সাহিত্য সাময়িক হতে পারে না। এখন কথা উঠেছে যে, কোনো একটা ইতিহাস থেকে সাহিত্য এসেছে। তা হতে পারে না। সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা একেলা—সে ভিতর থেকে প্রকাশ করে।

এ বিশেষভাবে বলছিলুম—তা শোনবার যোগ্য। আমি যে ভোরবেলায় উঠে তাড়াতাড়ি সূর্যোদয় দেখবার জন্য বাইরে যেতুম সেই শীতের দিনেতে—সে এই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নয়। সে ভোর রাত্তিরে ছুটেছে। নারকেল গাছে রোদ্দুর ঝিলমিল করছে, তা দেখতে। একদিনও আমি বঞ্চিত হতুম না দেখতে। এটা তো কোনো ইতিহাসে ছিল না। এই মনোবৃত্তিটা যে কবির সে একেলা।

(৭জুলাই ১৯৪১, আলাপচারি, রবীন্দ্রনাথ)

৬। আজ যারা সাহিত্যের আসরে প্রলেটারিয়েট, সর্বহারা—এ সব কথা বলে চেঁচাচ্ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—কোন্‌খানে তোমরা কাজ করছ। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা নয়; তোমরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছ? সাহিত্যে এ-সব বলার মধ্যে গুণপনা থাকতে পারে—কিন্তু এটা সে ক্ষেত্র নয়। এখানে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে।…আমাকে বুর্জোয়া বলে—আমি তো করেছি এই সব কাজ। কিন্তু যারা তা নয়। তারা কী করছে।

(২৭ মে ১৯৪১, আলাপচারি)

৭। সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে এ-রকম রচনা খুব কম লিখেছি। বাংলাদেশের যে একটা মাহাত্ম্য আছে—আমার আগে এ আর কেউ দেখে নি এই চোখে। আমাদের দেশের লোকের ধারণা আছে যে, আমি কী করে বুঝব—আমি কি তাদের মধ্যে থেকেছি, দেখেছি। আমি হলুম বড়োলোক; গরিবের বেদনা, দৈনন্দিন সুখদুঃখের ওঠানামা—তার আমি কী জানি।…গরিবের ঘরে তো অনেকেই জন্মেছে। কিন্তু তারা দেখে নি—কখনো আমার মতো করে তারা দেখে নি। ছোটো গল্প, বাংলার পল্লীর গল্প এর আগে আর হয় নি।

(২৬মে, ১৯৪১, আলাপচারি)

৮। যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কি ভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সাহিত্য একটা যুগের প্রতিবিম্বস্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিবিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে

ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোনো প্রধান লেখককে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা বা নিন্দাবাদ না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগলক্ষণ কি পাওয়া যায়, তাহাই নির্দেশ করা বিধেয়। এক এক যুগের শিক্ষাদীক্ষার ঐতিহাসিক কারণগুলি বিবৃত করিয়া কবিগণকে সেই শিক্ষাদীক্ষার পাণ্ডা স্বরূপ দাঁড় করাইয়া তাঁহার প্রসঙ্গে সমস্ত জাতির চরিত্র নির্দেশ করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য—নতুবা কোনো একটি লোককে তাঁহার যুগ হইতে পৃথক করিয়া আনিয়া বর্তমান কালের নৈতিক কি সামাজিক রুচির মাপকাঠি দিয়া বিচার করা সংগত নহে।…যে সকল কবি ঝড়ের মত তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাবের আতিশয্যে পাঠকচিত্তকে উলটপালট ও অভিভূত করিয়া ফেলেন; রবীন্দ্র তাহাদিগের অনুরক্ত নহেন। তিনি সেই সকল কবির পক্ষপাতী যাঁহারা বর্ণিত বিষয়ের প্রাধান্য দিয়া নিজেকে একেবারে আড়াল করিয়া রাখিতে পারেন, এইজন্য তিনি বাইরণ-জাতীয় কবির কবিত্ব স্বীকার করেন না, বাল্মীকির মত বিষয়গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মহারা কবির অনুরাগী।

(ঘটনাসময় ১৯০৭, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য', দীনেশচন্দ্র সেন)

৯। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল…একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই।

(নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'কবিতা', আষাঢ়, ১৩৪৮)

১০। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো

বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।

(বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'কবিতা', আশ্বিন, ১৩৪৮)

১১। সেদিন দেখলুন একজন সমালোচক লিখেছেন, আমার গল্প অভিজাত সম্প্রদায়ের গল্প, সে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না। গল্পগুচ্ছের গল্প বোধ হয় তিনি আমার বলে মানেন না।

(রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রভাতরবি, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৪)

১২। "উনি তো ধনীঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।" আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন।

(বাঁকুড়ার জনসভায় রবীন্দ্রনাথ। 'প্রবাসী', ১৩৪৭)

১৩। মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা। একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে, তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া ওঠে। এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল, তেমনি আর এক-শ্রেণীর কবি আছে যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়।

(রামায়ণ, 'প্রাচীন সাহিত্য', ১৩১০)

১৪। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্মন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। ··· তেমনি এখনকার

কবি কুমারসম্ভবে হতমনোরথ পার্বতীর দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন।

(কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, 'প্রাচীন সাহিত্য', ১৩০৮)

এক দিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্য দিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুই-ই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। ··· দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ—আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় কুমারসম্ভবে দেখাইয়াছেন।

(কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা)

১৫। য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহকুমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণকথার একটি নূতন-বাঁধা তার (মেঘনাদবধকাব্য) ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি—তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরাও ঠেকাইতে পারি নাই।

(সাহিত্যসৃষ্টি, 'সাহিত্য', ১৩১৪)

১৬। য়ুরোপ-আমেরিকা তাহার প্রকাণ্ড কর্মশালা লইয়া আমাদের চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই দেখিয়া আমাদের অবস্থা বড়ো হইবার পূর্বেই আমাদের নজর বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে কাজ দেখিতে ছোটো তাহাতে উৎসাহই হয় না; এইজন্য বীজরোপণ করা হইল না, একেবারে আস্ত বনস্পতি তুলিয়া আনিয়া পুঁতিয়া অন্য দেশের অরণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

(সাহিত্যপরিষৎ, 'সাহিত্য', ১৩১৩)

১৭। য়ুরোপে একদিন ফ্যাডালতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। সেই তন্ত্রে সেখানকার নিম্নস্তরের জনসাধারণ উচ্চস্তরের শাসনকর্তাদের স্বার্থভার বহন করে এসেচে —এক দলের দাসত্বের উপর আর একদলের প্রভুত্ব নির্ভর করেচে। তারপরে

আজ সেখানে ডিমক্রেসির প্রাদুর্ভাব। এই ডিমক্রেসির প্রভাবে সেখানকার সমাজে অন্য ভেদরেখা ক্ষীণ হয়ে এসে ধনী নির্ধনের ভেদরেখা বিপুল হয়ে উঠেচে। এখন সেখানে অনেকদিন থেকেই ধনিকের স্বার্থ কর্মিকেরা বহন করে এসেচে। এই ধনিকের স্বার্থজাল আজ সমস্ত জগৎকে বেষ্টন করেচে।

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ ফাল্গুন)

* * *

১৭ নম্বর উদ্ধৃতি থেকে মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। শুধু তাই নয় সেই দর্শনে রচিত ইতিহাসও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সামন্ততন্ত্রের দাসত্ব-প্রভুত্ব তো বটেই, এমন কি পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যে খাঁটি গণতন্ত্র নয়, ধনী-নির্ধনের ভেদ যে সেখানে বিপুল, এটাও তাঁর কাছে সত্য মনে হয়েছিল। অবশ্য ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এটা কেবলই প্রাথমিক স্তরের কথা, এই দর্শনের মূল কথা শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং সেই প্রসঙ্গে আসে ধনতন্ত্রের দুই শ্রেণীর কথা : বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েট। ১ নম্বর উদ্ধৃতি থেকে মনে হবে, রবীন্দ্রনাথ আদৌ এই দর্শন গ্রহণ করেন নি, বুর্জোয়া প্রলেটারিয়েট সংঘাত ব্যাপারটা পুরোপুরি রাশিয়ান ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এবং এই দর্শন সম্পর্কে সম্যক আলোচনা বা ধারণা করার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নি। রবীন্দ্রনাথের জন্ম জমিদার-বংশে এবং পেশায় তিনি জমিদার, অতএব তিনি কোনমতেই জাতবুর্জোয়া হতে পারেন না। যদি তাঁকে কেউ বুর্জোয়া বলে অভিহিত করে, তবে সেটা তাঁর পক্ষে প্রশংসাসূচক বলেই গণ্য করা উচিত, কেননা সামন্ততন্ত্রে লালিত হয়েও তিনি সেই সমাজের পক্ষে প্রগতিশীল শ্রেণী বুর্জোয়া বলে অভিহিত হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগের মানুষ ভারতবর্ষে সেই যুগে চলছে সাম্রাজবাদী-সামন্তবাদী শাসন, যে-শাসনে জাতীয় বুর্জোয়ারা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে পারছে না। সেই যুগে যদি রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া ধ্যানধারণার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন, তাহলে নিঃসংশয়ে বলা যাবে রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া ভাবা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অপমানকর নয়। কিন্তু ১ নম্বর উদ্ধৃতি থেকে এটাই অনুমেয় যে রবীন্দ্রনাথকে যদি বলা হতো তিনি প্রলেটারিয়েটদের মুখপত্র তাহলেই তিনি খুশি হতেন। যদিও ওই উদ্ধৃতি

থেকে এটাও অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রলেটারিয়েট শব্দের অর্থ জানতেন না, যে জন্য কৃষিজীবী সাঁওতালদের তিনি প্রলেটারিয়েট বলে গণ্য করেছিলেন। অবশ্য প্রলেটারিয়েট সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধার ভাব ছিল না, তাকে তিনি সমাজের নুড়িপাথর পাঁক বলেই ভাবতেন। রবীন্দ্রনাথের এই স্ববিরোধিতা, একই সঙ্গে নিজেকে প্রলেটারিয়েট না-ভাবাকে অপমানকর ভাবা আবার প্রলেটারিয়েটকে নুড়ি বালি পাঁক ভাবা, এর মূল কারণ অবশ্য অন্যত্র। মূল কারণ, তিনি নিজেকে শ্রেণী ভেদের ঊর্ধ্বে (১২ নম্বর উদ্ধৃতি) এবং সাহিত্যকেও শ্রেণীর ঊর্ধ্বে মনে করতেন। সাহিত্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়; অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ, রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় বলে তিনি স্বীকার করতেন না। ১০ নম্বর উদ্ধৃতিও তাঁর এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়। তৎসত্ত্বেও ৬, ৭, ৯, ১১, ১২ নম্বর উদ্ধৃতিগুলো এটারও সাক্ষ্য দেবে যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে, বিশেষ করে গল্পগুচ্ছে, গরীব এবং মধ্যবিত্ত সমাজের ধ্যানধারণা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল বলে তিনি নিজেই দাবি করেছেন। সাহিত্য সময়ের ও শ্রেণীর ঊর্ধ্বে (৪ ও ৫ নম্বর উদ্ধৃতি) আবার সাহিত্য সময়ের এবং সমাজের প্রতিবিম্ব (৮, ১৩, ১৪ নম্বর উদ্ধৃতি)। রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে একটা ধারণাই হওয়া সম্ভব : মার্কসিজম, বিশেষ করে সাহিত্যে মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুব ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এটা তাঁর পক্ষে বিশেষ দোষাবহ নয়, কারণ বাঙলাদেশেই তখন মার্কসীয় দর্শন খুব পরিচিত দর্শন ছিল না। এবং তৎকালীন মার্কস-বিদ্ বাঙালি লেখকেরা ঝোঁকের মাথায় অযৌক্তিক তত্ত্বের অবতারণা করে মার্কসকে মোটামুটি একটা হাস্যকর অবস্থায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বা মার্কস কেউই এই হাস্যকরতার জন্য দায়ি নন।

* * *

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে ৯০টি গল্প আছে। এর তিনটি গল্পের চরিত্রের কোনো সামাজিক শ্রেণী নির্ণয় সম্ভব নয় : রাজপথের কথা, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, একটি আষাঢ়ে গল্প। বাকি ৮৭টি গল্পের মূল চরিত্রের শ্রেণী-নির্ণয় সম্ভব। এই গল্পগুলো দুরকম : গ্রাম-আশ্রিত এবং শহর-আশ্রিত।

এই দুইশ্রেণীর গল্পও আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ বিত্তবান, মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন।

গ্রাম-আশ্রিত বিত্তবানদের গল্প ঃ ভিখারিণী, ত্যাগ, জীবিত ও মৃত, দানপ্রতিদান, সমস্যাপূরণ, নিশীথে, প্রতিহিংসা, উদ্ধার, শুভদৃষ্টি, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, পুত্রযজ্ঞ, হালদার গোষ্ঠী, মণিহার, স্ত্রীর পত্র, তপস্বিনী। (১৫টি গল্প)

গ্রাম-অশ্রিত মধ্যবিত্তদের গল্প ঃ ঘাটের কথা, পোস্টমাস্টার, সম্পত্তি-সমর্পণ, মুক্তির উপায়, ছুটি, সুভা, মহামায়া, সম্পাদক, সমাপ্তি, অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, দিদি, অতিথি, দুর্বুদ্ধি, উলুখড়ের বিপদ, গুপ্তধন, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা, বোষ্টমী, মুসলমানীর গল্প। (২০টি গল্প)

গ্রাম-আশ্রিত বিত্তহীনদের গল্প ঃ শাস্তি। (১টি গল্প)

শহর-আশ্রিত বিত্তবানদের গল্প ঃ মুকুট, দালিয়া, রীতিমতো নভেল, জয়-পরাজয়, অসম্ভব কথা, খাতা, প্রায়শ্চিত্ত, মানভঞ্জন, দুরাশা, সদর ও অন্দর, ফেল, প্রতিবেশিনী, নষ্টনীড়, কর্মফল, রাজটিকা, হৈমন্তী, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার, বলাই, চোরাই ধন, প্রগতিসংহার। (২৪টি গল্প)

শহর-আশ্রিত মধ্যবিত্তদের গল্প ঃ দেনাপাওনা, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, কঙ্কাল, একরাত্রি, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, মধ্যবর্তিনী, বিচারক, আপদ, ঠাকুরদা, ক্ষুধিত পাষাণ, ইচ্ছাপূরণ, দর্পহরণ, মাল্যদান, মাস্টারমশায়, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, ভাইফোঁটা, পয়লা নম্বর, বদনাম, চিত্রকর, শেষ পুরস্কার। (২৬টি গল্প)

শহর-আশ্রিত বিত্তহীনদের গল্প ঃ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। (১টি গল্প)

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলোর সঙ্গে যদি 'তিনসঙ্গী'র গল্প যোগ করা যায়, দেখা যাবে, 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পই শহর-আশ্রিত বিত্তবানদের গল্প।

এই তালিকা থেকে একটি কথা স্পষ্ট হওয়া উচিত, যে-ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের গল্প অভিজাতদের গল্প বলে গণ্য করেছিলেন (১১ নম্বর উদ্ধৃতি), তিনি একেবারে উড়ো কথা বলেন নি। ৯৩টি গল্পের ৪২টি গল্পই বিত্তবানদের গল্প। বাকি অনেকগুলোর গল্পেরও মূলধারা প্রবাহিত হয়েছে নিম্নবিত্তদের উচ্চতর বিত্তবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অথবা বিত্তবান থাকার স্মৃতি বা তার

সংসর্গপ্রীতি থেকে। এই ধরণের গল্প আছে ১৪টি ঃ দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, মেঘ ও রৌদ্র, আপদ, ঠাকুরদা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, রাজটিকা, সদর ও অন্দর, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, মাল্যদান, মাস্টারমশায়, রাসমণির ছেলে। দেনাপাওনা এবং যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ গল্পদুটোতে সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে মধ্যবিত্ত কন্যার বিত্তবান পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে। পোস্টমাস্টার এবং মাল্যদানের ট্র্যাজেডি ঘটেছে নিম্নবিত্তদের বিত্তবানের প্রতি প্রেমের সঞ্চার ঘটাতে। ঠাকুরদা ও রাসমণির ছেলের গল্পের সমস্যা বিত্তবান থাকার স্মৃতিঘটিত। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ও মাস্টারমশায়ের ট্র্যাজেডি ঘটেছে উচ্চতর বিত্তবানদের প্রতি আনুগত্য বা স্নেহের আধিক্য থেকে। প্রতিহিংসার সমস্যাও একই। ক্ষুধিত পাষাণের কেন্দ্রবিন্দু মধ্যবিত্ত লোকের নবাবী আমলের স্বপ্ন। মেঘ ও রৌদ্র এবং রাজটিকার কেন্দ্রবিন্দু শাসকশ্রেণীর প্রতি শাসিতদের ক্রোধ এবং লোভ থেকে। সদর ও অন্দর গল্পের সমস্যাও বিত্তহীন সমাজের প্রতি বিত্তবান সমাজের উপেক্ষামিশ্রিত প্রেম-অপ্রেম। আপদ গল্পের মূল রস বিত্তহীনতার প্রতি কৃপামিশ্রিত স্নেহ।

আবার ৯ নম্বর উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যেমন দাবি করেছেন যে তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ততা বা পল্লীজীবনের ধারাবাহিকতা আছে, সেই দাবিও সম্পূর্ণ অমূলক নয়। তবে ৭ নম্বর উদ্ধৃতিতে তিনি যদি গরিব বলতে বিত্তহীনদের কথা মনে করে কথাটা বলে থাকেন, তাহলে বলতেই হবে, ৯৩টি গল্পের মধ্যে মাত্র ২টি গল্পতেই শুধু গরিবদের কথা পাওয়া যায়ঃ শাস্তি এবং খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন।

* * *

সাহিত্যে সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার কী সম্পর্ক, সে-বিষয়ে মার্কসের মত বা মার্কসীয় দর্শনের পুরো বিচার আজও শেষ হয় নি। তবে যাঁরা মনে করেন লেখকের শ্রেণীসত্তা তাঁর সাহিত্যের শ্রেণীসত্তা নির্ধারণ করে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প নিয়ে অবশ্যই বিপাকে পড়বেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও পেশা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক লেখক হতে বাধ্য। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের মূলসুর সামন্ততন্ত্রবিরোধী।

সামন্ততন্ত্রের একটা প্রধান লক্ষণ ধরা হয়, পরিবারের প্রতি আনুগত্য, জাতিভেদের প্রতি আনুগত্য। রবীন্দ্রনাথের ১২টি গল্পের বিষয়, পরিবারের প্রতি বিদ্রোহ করে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ: রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, দানপ্রতিদান, শাস্তি, দিদি, মানভঞ্জন, পুত্রযজ্ঞ, হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর, বদনাম। শাস্তি গল্পে অবশ্য পরিবারের প্রতি আনুগত্যের জন্য ব্যক্তির সংহার ঘটল, কিন্তু লেখকের সহানুভূতি যে ব্যক্তির প্রতিই সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জাতিভেদ বনাম ব্যক্তিত্বের গল্প: ত্যাগ। অস্পৃশ্যতা বনাম ব্যক্তিত্বের গল্প: অনধিকার প্রবেশ।

সামন্ততন্ত্রের আর একটি লক্ষণ: ধনৈশ্বর্য ব্যবহার না করে তাকে যক্ষের মতো আগলে রাখা। এই সমস্যা থেকে ট্র্যাজেডির সঞ্চার: সম্পত্তি, সমর্পণ, গুপ্তধন।

বাঙলাদেশের সামন্ততন্ত্রের একটা লক্ষণ, বিবাহে পণপ্রথা, যেখানে পাত্রীর দাম তার অর্থমূল্যে। এই পণপ্রথাকে আক্রমণ করে লেখা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প: যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, দেনাপাওনা, অপরিচিতা, হৈমন্তী।

বোষ্টমী গল্পের বোষ্টমী সংসার ত্যাগ করে আপন ব্যক্তিত্ব ও শুচিতা রক্ষার জন্য।

জমিদারের বিশুদ্ধ উৎপাতের বিরুদ্ধে লেখা ছোট গল্প: উলুখড়ের বিপদ।

সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যের বিরুদ্ধে লেখা: খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন।

সামন্ততান্ত্রিকতা এবং মার্কেন্টাইলিজমের বিরুদ্ধে লেখা: তপস্বিনী।

* * *

১৩২১ সালে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রবাসী এবং সবুজপত্র মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনা করে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনেছেন, কিন্তু দৈন্যের মধ্যে বিশ্বাসের ছবি এঁকেছেন, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গেয়েছেন। সে ছবি সে সংগীত জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করতে পারে নি, কারণ সে ছবি সে সংগীত বাস্তব নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্য জনসাধারণকে বা জাতিকে স্পর্শ করতে পেরেছে কি পারে নি, না পারলে তার কারণ কী, সে বিচার অন্য। কিন্তু দরিদ্রের ক্রন্দনের

মধ্যে বিশ্বাস এবং আশার সংগীতের কথা যে আদৌ ঠিক নয়, তার প্রমাণ, তাঁর অনেক ছোট গল্পের বিষন্ন সুর।

এই গল্পগুলোতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের ক্রন্দন এবং বিষণ্ণ সুর স্পষ্ট: শাস্তি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোস্টমাস্টার, ছুটি, সুভা, সম্পাদক, দিদি, দুর্বুদ্ধি, উলুখড়ের বিপদ, গুপ্তধন, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা, দেনাপাওনা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, মধ্যবর্তিনী, বিচারক, আপদ, ঠাকুরদা, মাল্যদান, মাস্টারমশায়, ভাইফোঁটা, পয়লা নম্বর।

১৩২১ সালে রাধাকমল যে-কথা বলেছিলেন, সে-কথা আজও বলা হয়, সামান্য পরিবর্তন করে: রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সমস্যার সমাধান করতেন আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা এই মত সমর্থন করে না।

* * *

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব ছোটগল্প লেখা হয়েছিল, সাময়িক পত্রিকার চাপে। নিচের তালিকা লক্ষ্য করা যাক।

১২৮৪ ভারতী	: ভিখারিণী।
১২৯১ ভারতী	: ঘাটের কথা।
১২৯১ নবজীবন	: রাজপথের কথা।
১২৯২ বালক	: মুকুট।
১২৯৮ হিতবাদী	: দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি।
১২৯৮ সাধনা	: খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তিসমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়।
১২৯৯ সাধনা	: ত্যাগ, একরাত্রি, একটি আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, রীতিমতো নভেল, জয়পরাজয়, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, মহামায়া, দানপ্রতিদান।
১৩০০ সাধনা	: সম্পাদক, মধ্যবর্তিনী, অসম্ভব কথা, শাস্তি, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, খাতা।

১৩০১ সাধনা : অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আপদ, দিদি।

১৩০২ সাধনা : মানভঞ্জন, ঠাকুরদা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি।

১৩০২ সখা ও সাথী : ইচ্ছাপূরণ।

১৩০৫ ভারতী : দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, রাজটিকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান।

১৩০৭ প্রদীপ : সদর ও অন্দর।

১৩০৭ ভারতী : উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল।

১৩০৮ ভারতী : নষ্টনীড়।

১৩০৯ বঙ্গদর্শন : দর্পহরণ, মাল্যদান।

১৩১৪ প্রবাসী : মাস্টারমশায়।

১৩১৪ বঙ্গভাষা : গুপ্তধন।

১৩১৮ ভারতী : রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা।

১৩২১ সবুজপত্র : হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা।

১৩২৪ সবুজপত্র : তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী।

১৩৩২ প্রবাসী : নামঞ্জুর গল্প।

১৩৩৫ প্রবাসী : সংস্কার, বলাই।

১৩৩৬ প্রবাসী : চিত্রকর।

১৩৪০ ছোট গল্প : চোরাই ধন।

১৩৪৬ আনন্দবাজার পত্রিকা : রবিবার।

১৩৪৬ শনিবারের চিঠি : শেষকথা।

১৩৪৭ আনন্দবাজার পত্রিকা : ল্যাবরেটরি।

১৩৪৮ বদনাম : বদনাম।

১৩৪৮ আনন্দবাজার পত্রিকা : প্রগতি সংহার।

১৩৪৯ বিশ্বভারতী পত্রিকা : শেষ পুরস্কার।

১৩৬২ ঋতুপত্র : মুসলমানীর গল্প।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি এমন গল্পসংখ্যা মাত্র চারটি : যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী এবং কর্মফল।

সাময়িক পত্রিকার চাপ অবশ্যই বাইরের চাপ। ভেতরের চাপ, রবীন্দ্রনাথ নিজে জানাচ্ছেন, বাংলার পল্লীজীবনের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের সূত্র (৩ নম্বর উদ্ধৃতি)।

নতুন ধরণের ছোট গল্পের সূত্রপাতই শুধু রবীন্দ্রনাথ করেন নি, অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম্য মানুষের প্রথম আবির্ভাবও হলো রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে। গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ ছিন্নপত্র-তে পাওয়া যায়, তাতে অবশ্য এটাই মনে হয়, তাঁর দেখা ছিল দূর থেকে দেখা। ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটলে হয়ত তাঁর রচনায় গ্রাম্যজীবনের আরো নিকট, ঘনিষ্ঠ, বিস্তৃত এবং জটিল চিত্র ফুটত। তাঁর এই দৃষ্টি খণ্ড ছিল বলে, প্রমথনাথ বিশী অনুমান করেছেন (রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প) তাঁর গ্রাম্য দর্শন রূপ পেয়েছে ছোটগল্পে। নিকটতর পরিচয় থাকলে হয়ত তিনি গ্রাম্যজীবনের উপর উপন্যাস লিখতে পারতেন, যেখানে প্রয়োজন আরো বিস্তৃত এবং নিকট পরিচয়। এই খণ্ড দৃষ্টিতে তাঁর মনে হয়েছে গ্রাম্যজীবন সহজ সরল। অপরিচয়ের জন্য এই জীবনটি তাঁর মনে হয়েছে রহস্যময়। এই সরলতা ও রহস্যময়তা তৈরী করেছে তাঁর গ্রাম্যজীবনের ছোটগল্পের পরিমণ্ডল। এই জন্যেই কারো কারো মনে হয়েছিল তাঁর ছোটগল্প গীতধর্মী। অবশ্য তাঁর ছোটগল্পকে গীতধর্মী বলায় রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হতেন, তাঁর ধারণায় কল্পনার আবেশ বেশি থাকলেই তা হয় গীতধর্মী, যেমন কঙ্কাল অথবা ক্ষুধিত পাষাণ, কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ গল্পে যেহেতু বাস্তবতাই প্রধান, অতএব তাঁর গল্প গীতধর্মী নয়। রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা সকলের কাছে অবশ্য গ্রহণীয় নয়। ১২৯৮ থেকে ১৩০২ সাল পর্যন্ত, যে-সময়ের কথা রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলছেন, সবশুদ্ধ গল্প লেখা হয়েছে ৪৪টি গল্প। এর মধ্যে গ্রামআশ্রিত গল্প হলো : পোস্টমাস্টার, সম্পত্তি সমর্পণ, মুক্তির উপায়, ত্যাগ, জীবিত ও মৃত, ছুটি, সুভা, মহামায়া, দানপ্রতিদান, সম্পাদক, শান্তি, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, নিশীথে, দিদি, অতিথি, অর্থাৎ ১৮টি। এর মধ্যে যে পাঁচটি গল্প বিত্তবানদের নিয়ে লেখা (ত্যাগ, জীবিত ও মৃত,

দান প্রতিদান, সমস্যাপূরণ, নিশীথে) সেইগুলো কেবলই গ্রামীণ সমস্যা নিয়ে লেখা বলে গণ্য করা যায় না। বাকি ১৩টি গল্পের গ্রাম্যজীবন ছাড়া যে-গল্প তৈরি হতে পারত না সেক'টি হলো : পোস্টমাস্টার, সম্পত্তি সমর্পণ, ছুটি, সুভা, মহামায়া, শাস্তি, সমাপ্তি, অনধিকার প্রবেশ, দিদি, এবং অতিথি অর্থাৎ ১০টি। এই তালিকার একটু বিস্তৃত পরিচয় এইজন্য দেওয়া হলো, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে যে-কথাটি মনে হতে পারে, অর্থাৎ তাঁর ছোটগল্প বিশেষ করে জমিদারি উপলক্ষ্যে পল্লী বাঙলায় থাকার সময় লিখিত ছোটগল্পে পল্লীজীবনের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যাবে, সেটা ঠিক নয়। অর্থাৎ মাত্র ১০টি গল্পের উপর নির্ভর করে তাঁর ছোট গল্পের এই ধারাবাহিকতার পরিচয় দেওয়া সমীচীন নয়, বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের চিঠি এত বেশি আলোচনা হয় যে মনে হয়, যেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পল্লীজীবন ছাড়া আর কিছু নেই। তিনটি মাত্র গল্প—সমাপ্তি, পোস্টমাস্টার এবং ছুটি—তিনটির উপর নির্ভর করেই সম্ভবত তাঁর ছোটগল্পের এই খ্যাতি গড়ে উঠেছে। ছিন্নপত্রে পল্লীজীবনসংসারের যত প্রসঙ্গ এসেছে তার অতি সামান্য অংশ প্রতিফলিত হয়েছে ছোটগল্পে। বরং পল্লীবাঙলার পূর্ণতর ছবি ফুটেছে অন্য গল্পগুলোতে : সুভা, শাস্তি, দিদি এবং অতিথি গল্পে। সমাপ্তি, পোস্টমাস্টার এবং ছুটির মূল আবেদন পল্লীর অনুষঙ্গেও নয়, পল্লী-নগরের সংঘাতের অনুষঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্পে অবশ্য পল্লীপ্রকৃতি এসেছে, যেমন পদ্মার বর্ণনা খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে, বা মেঘ ও রৌদ্র গল্পের ভূমিকাতে। কিন্তু এইসব গল্পের মূল সুর বা সমস্যা গ্রামীণ নয়, এখানে প্রকৃতির স্থান বাতাবরণ হিসেবে। 'সোনার তরী' কাব্যে বর্ষাযাপন কবিতায় তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি যে 'ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা'র কথা বলেছিলেন সেই 'অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্তির ধুলা' মাত্র কয়েকটি গল্পেই এসেছে। মেঘ ও রৌদ্রের মূল সুর সাম্রাজ্যবাদ-বিদ্বেষী, তা সাধারণ গ্রাম্যজীবনের কথা মোটেই নয়। যদি তখনকার গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে তিনি ঘনিষ্ঠ পরিচিতি চাইতেনই, তাহলে সম্ভবত তাঁর অধিকাংশ গল্পই প্রবাহিত হতো 'উলুখড়ের বিপদ' গল্পের খাতে। কিন্তু অপরিচয়ের জন্যই মেঘ ও রৌদ্র গল্পের শেষ

হয় একটি আপাত-প্রক্ষিপ্ত দশম পরিচ্ছেদের মধ্যে, গিরিবালার রোমান্টিক স্মৃতি আচ্ছন্ন করে বাস্তব জীবনের শশিভূষণকে।

* * *

রবীন্দ্রনাথের নিজের পছন্দ ছিল তাঁর সাধনায় প্রকাশিত ছোটগল্পগুলো। সেগুলো তাঁর মনে হতো অনেক **fresh, spontaneous**। পরবর্তী গল্পে তাঁর সেই স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সজীবতা নেই, এসেছে মনস্তত্ত্ব—একথা মনে হয়েছে লেখকের স্বয়ং। এই মনে হওয়ার হয়ত একটা গূঢ়তর ব্যঞ্জনা আছে। পরবর্তী গল্পগুলোয়, বিশেষ করে সবুজপত্র যুগে, তাঁর ছোটগল্পে। পরিবারের বিরুদ্ধে, জাতি ভেদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ প্রকাশিত হচ্ছে, যে বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের বিদ্রোহের লক্ষণ। যদিও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এই বুর্জোয়া লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, আমরা জানি সেযুগ বুর্জোয়া যুগ নয়, ঘোরতর সামন্ততান্ত্রিক যুগ এর একটা ব্যাখ্যা এইভাবেই সম্ভব, সমাজের মননশীল ব্যক্তিরা অনেক সময়েই সমাজের ভবিষ্যৎ প্রগতিশীলতার ধারক হয়ে থাকেন। যদিও ভারতবর্ষে বুর্জোয়াসির জন্ম হয় নি, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় দীক্ষিত হওয়ায়, পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আকর্ষণে ভারতবর্ষের অনেক মননশীল ব্যক্তিরই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অনেক কিছুতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, জাতীয়তাবাদ চেতনায়, ব্যক্তিত্বের প্রকাশে, কর্মনিষ্ঠতায়। রবীন্দ্র সাহিত্যেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। ১৫ নম্বর উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট, মধুসূদনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব লক্ষ্য করেছেন এবং তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবিষয়েও অবহিত যে মুষ্টিমেয় ইংরেজিবিদ্ ব্যক্তির দ্বারা একটি পুরো জাতির, পুরো দেশের সভ্যতা পরিবর্তিত করা যায় না। ১৬ নম্বর উদ্ধৃতি থেকে তাঁর এই মনোভাব স্পষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণে ভারতবর্ষে দুর্বল ধনতন্ত্রের জন্ম হয়েছে, ফলে ধনতান্ত্রিক সভ্যতাও দুর্বল, ধনতান্ত্রিক সাহিত্যও দুর্বল। হয়তো একারণেই বুর্জোয়া লক্ষণাক্রান্ত তাঁর পরবর্তী ছোটগল্পগুলোও তাঁর কাছে **fresh** বা **spontaneous** মনে হয়। পূর্ণ বুর্জোয়াতন্ত্রে যে সবলতা, যে উদ্দামতা দেখা দেয়, পাশ্চাত্ত্য ধনতন্ত্রে যার সাক্ষ্য প্রবল, রবীন্দ্রনাথে বুর্জোয়াঘেঁষা

ছোটগল্পে সেই উদ্দাম সবলতা অনুপস্থিত। হয়ত তার কারণ, ভারতবর্ষের দুর্বল বুর্জোয়া সভ্যতা। আবার তাঁর প্রথমদিকের গল্পগুলোতে যেখানে গ্রামীণ বাঙলার ছবি পাওয়া যায়, তাতে আছে বিষণ্ণ সুর। সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে বুর্জোয়াদের যে ক্রোধ বা ঘৃণা দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথে সেই ক্রোধ বা ঘৃণার পরিবর্তে যে সুর প্রবল তা হলো গ্লানিবোধের। হয়ত রবীন্দ্রনাথের জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত শ্রেণীসত্তাই এই সুরের কারণ।

বাউল সঙ্গীতে মানুষ

প্রদীপ ভট্টাচার্য

বাউলের সাধনার মূলমন্ত্র 'মনের মানুষ'কে পাওয়ার সাধনা। এই মনের মানুষ কোথায় থাকে,—সে বাইরে কোথাও নয়, সে থাকে রক্তে মাংসে গড়া মানুষের মধ্যেই। কিন্তু তবুও সে 'অধরা' কেন না তাকে আমরা খুঁজে পাইনা। কবির ভাষায়—

"আমি কোথায় পাব তারে।
আমার মনের মানুষ যেরে॥"

আর এই খোঁজার সাধনাও কঠিন। এর জন্য দরকার কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা এবং ষটচক্র ভেদ করা। —"কুলকুণ্ডলিনী মহারাণী বিরাজ করেন শতদলে।" তাই একে বলা হয় "কায়া সাধনা" বা "দেহতত্ত্বের সাধনা"। মোক্ষ সাধনার 'পথ' ও 'পদ্ধতি'র কথা যেমন বাউল সঙ্গীতে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় ধর্মীয় আবরণের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বিক মানবিকতার দিক। যেখানে মানুষকেই সবার উপরে সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সাধনার আধার হিসাবেই নয়; সাধনার বাইরেও মানুষের মহান অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

"মানুষ মাঝে
মানুষ সমাজে
মানুষের পদে সঁপে দাও প্রাণ"।

এটাকে হয়ত কেউ কেউ মানব সর্বস্ব মানবিকতার প্রতিধ্বনি হিসাবে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠা বোধ করবেন, কিন্তু যে যুগে "বাউল" সাধনার উৎপত্তি হয়েছিল সে যুগেও আমরা অনেক জায়গায় জীবজন্তু এবং 'জড়বস্তুর' মধ্যে দিয়ে সাধনা করার উদাহরণ পাই।

বাউল সাধনার উৎপত্তি নিয়ে নানান মতভেদ আছে। কেউ বলেন

'বেদের অংশ'। প্রখ্যাত বাউল সঙ্গীত গায়ক পূর্ণদাসের মতও তাই। আবার মুহম্মদ মনসুউদ্দীন তাঁর 'হারামনি' গ্রন্থে বলেছেন—"এই বাউল সঙ্গীতের জন্ম কি করিয়া কোথা হইতে হইল তাহা আদৌ জানা যায় না"। তিনি এই প্রসঙ্গেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথের মতে নাকি 'মহাযান' পন্থা হতেই বাউলের সৃষ্টি হয়েছে। এবং তিনি প্রসঙ্গত তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন···"আমার মনে হয় মহাযানীদের পূর্বেও বাউল সাধনার প্রচলন ছিল। কেননা, পাহাড়ী জাতিদের মধ্যে অনুরূপ সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ মারিয়াদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।" অর্থাৎ তিনি আর্য সভ্যতার আগেও 'বাউলের' সন্ধান পেয়েছেন।

মানুষকে নিয়ে এই সাধনাপদ্ধতি কেমনভাবে গড়ে উঠল—তা সত্যই খুবই গবেষণার বিষয়। তন্ত্রসাধনার প্রভাব বাউল গানে আছে—না বাউলের প্রভাব তন্ত্রসাধনায় আছে তা বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু এটা ঠিক যে তন্ত্রে দেহতত্ত্ব এবং দেহকে নিয়ে সাধন পদ্ধতির উল্লেখ আছে। কিন্তু বাউলেরা যেমনভাবে গানের মধ্যে দিয়ে এই মানুষকে স্পর্শ করেছে তার সাথে তন্ত্রের কিছু পার্থক্য আছে বৈকি। বরং বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের সাথে সম্পর্ক নিবিড়। বাউল সঙ্গীতে 'মানুষ'কে যেভাবে পাওয়া সম্ভব অন্য কোন সাধন সঙ্গীতে সেভাবে পাওয়া যায়নি। এখানকার মানুষ আমাদেরই একান্ত পরিচিত মানুষ। প্রতিদিন যাদের আমরা দেখি। কবি এদের আমাদের কাছের লোক হিসাবেই চিত্রিত করেছেন। কোন অপার্থিব রেখায় বিধৃত থেকে গিয়ে আমাদের জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। যখন দেখি কবি কুবীরশাহ (উনবিংশ শতাব্দী) তাঁর গানে বলেন···

"এই মানুষকে করবে বিশ্বাস
এই মানুষ জানিও সত্য নির্যাস।"

তখন বুঝতে ভুল হয়না কবি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা মানুষের কথা বলেছেন।

বাংলা পুরাণ সাহিত্যে যেমন, মঙ্গল কাব্যেও মানুষের কথা আছে। কিন্তু সে মানুষকে আমাদের মত মানুষ বলে মেনে নিতে কষ্ট বোধ হয়।

এরা সকলেই স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমার। এদের আচরণ, কথাবার্তায় একটা অবিশ্বাসী আবরণ রক্তে মাংসে গড়া মানুষ থেকে পার্থক্য রচনা করেছে। এই মানুষ দেখে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। কিন্তু বাউলে মানুষ যেন একেবারেই আলাদা, আমাদের ঘরের মানুষ।

মঙ্গলকাব্য বিশেষ একটি সময়ে রচিত। কিন্তু বাউল গান অজানা অতীত থেকে সৃষ্ট হয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বয়ে চলেছে। তাই মানুষের চেহারাও এখানে সাধারণ হয়ে উঠেছে।

বাউল সঙ্গীতে হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্মের যুগপৎ প্রভাব আছে; এবং এই রকম প্রভাব অন্য কোন সাধন-সঙ্গীতে আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু একটি জায়গায় হিন্দু ও মুসলমান কবিদের মধ্যে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে—মানব সত্যের প্রতিষ্ঠার। বাউল কবির ভাষায়—

"(আমার) প্রেম করা হইল না।
মনের মানুষ খুঁজিয়া পাইলাম না॥
মানুষ মানুষ অনেক আছে
প্রেম কি মিলে যার তার কাছে,
মানুষ চিনে মানুষ রতন
কখন মিলে না॥"

মানুষই কেবলমাত্র মানুষকে অনুভব করতে পারে, কারণ মানুষের মধ্যে 'হুঁশ' অর্থাৎ চেতনা আছে, এই হুঁশ মানুষকে চিনতে সাহায্য করে। একটি মানুষের সাথে আরেকটি মানুষের প্রেম বন্ধন রচনা করে। এইভাবেই আমাদের সমাজ-জীবন সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই তৈরী হয়ে আসছে। তাই এই মানুষকে অস্বীকার করে লভ্য বস্তু কখনই লাভ করা যায় না। বাউল কবিকে তাই বলতেই হয়—

"(ওরে) সেই মানুষের সঙ্গ চাহিলে
হইতাম রে সোনা॥"

বাউলের এই মানব ধর্ম সম্পর্কে পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন···"তাহাদের সবকিছুই মানবের মধ্যে, কাজেই তাহাদের···ধর্মকেই মানব ধর্মও বলা চলে।" এবং তিনি একথাও বলেছেন যে বাউলেরা

বলেন…"আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল সহজ নিত্য মানব সত্যের পরে। কাজেই যত কাল মানব ততকাল এই বউলিয়া মত। বেদ পথ তো সেদিনের। তাইতো কৃত্রিম। ঋষিরা সেইদিন তাহা রচনা করিয়াছেন। বউলিয়া সহজ মতই অনাদি কালের।"

এই 'মানব ধর্মকে' সম্বল করে যে সঙ্গীত বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল—তা বহু বর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে গ্রামে গঞ্জে নতুন করে বাউল সঙ্গীতের চর্চা দেখতে পাই। কিন্তু 'এই' সঙ্গীত তার অন্তর ধর্মের দিকে কোন পরিবর্তনকে গ্রহণ করেনি। 'মানুষ' আজও এই সঙ্গীতের প্রাণ। এই 'মানবধর্ম' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও একান্তভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে—"সন্ত বাউলদের মানবধর্ম বা **"Religion of Man"**. এর উপর ভাষণ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানব চেতনায় উপনিষদের প্রভাব গভীর সন্দেহ নেই কিন্তু সেখানে 'বাউল' ধর্মমত ও সঙ্গীতের কিছু প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। তিনি অল্প বয়সে বহুবার 'লালন ফকিরের কাছে গিয়েছিলেন এই ধারণাও কেউ কেউ করেন। এবং এই সঙ্গীতের প্রতি একটি সার্বিক আকর্ষণ তাঁর ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রামের 'নিরক্ষর' ও নিম্নবর্ণের সাধকেরা তাদের সঙ্গীতে কেন 'মানুষ'কে এতখানি প্রাধান্য দিয়েছিল তা সত্যই আশ্চর্যের কথা। পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে বাউল সঙ্গীতের উৎপত্তি। শাস্ত্র-প্রভাব বহির্ভূত হয়ে এর সাধনপন্থা কিন্তু তার অস্তিত্ব রক্ষায় কুণ্ঠিত হয়। বরং গৌরবের সাথে আজ সমাজে রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণেই যে বাউল সঙ্গীত 'নিম্নবর্ণের' মানুষের মনে অধ্যাত্ম চেতনা জাগিয়ে রেখেছিল। এবং অধ্যাত্মচিন্তা তাদেরই 'ঘরের মানুষের' মধ্যে দিয়েই রচিত হয়েছিল। 'অপার্থিব মানুষ' যতই শ্রদ্ধার পাত্র হোক না কেন তার প্রতি নিরক্ষর সাধারণ মানুষের আকর্ষণ যতই থাকুক না কেন তা কখনই হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনা। সাধারণ মানুষের কথা যেখানেই থাকনা কেন—তা চিরকালীন মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে বাধ্য। বাউল সঙ্গীত একদিন অপাংক্তেয় ছিল। আজ তা সমস্ত গণ্ডী অতিক্রম করে সার্বিক

মানব মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষের একান্ত গ্রহণীয় বস্তু হিসাবে চিহ্নিত। উপনিষদের কবি বলেছেন…

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"।

আর বাউল কবি বলেছেন…

"আছে মানুষ মানুষেতে,
যে পারে মানুষ দেখিতে চিনিতে।
মান-হুঁশ হয়ে মানুষ লয়ে
ফিরছেন সদাই তিনি হুঁশেতে॥
মানুষেতে মানুষ আছে,
মানুষ নাচায়, মানুষই নাচে,
মানুষ যায় মানুষের কাছে
মানুষ হইতে।
মানুষ বাঁকা, মানুষ সোজা
মানুষ ভূত আর মানুষ ওঝা,
মানুষ রাজা, মানুষ প্রজা
মানুষকে পূজিতে॥

দুই স্রষ্টাই তাঁদের সৃষ্টিতে মানুষকেই শ্রেষ্ঠ করেছেন। তাই যতদিন মানব সভ্যতার ইতিহাস, তার সংগ্রামের ইতিহাস, বেঁচে থাকবে ততদিন বাউল সঙ্গীতের মানুষও বেঁচে থাকবে।

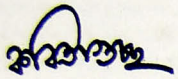

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা কবিতায় একটি নতুন আয়তন যোগ করেছেন। ১৯৫৫—৫৬ সালে "কবিতা" পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীলের "উনিশে বিধবা হয়ে কায়ক্লেশে উনত্রিশে এসে'—এই প্রথম পংক্তিসংবলিত কবিতাটি (কবিতাটির নাম মনে নেই) আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো। কেননা সুনীল আমাদের জানিয়েছিলেন যে ঐ বিধবা মহিলাটির একজন গোপন প্রেমিক আছে, মহিলাটি আসন্নসম্ভবা, এবং তাকে 'বাঁচাতে পারবে না কোনো ভবিষ্যের বীরসিংহ শিশু'। তার কিছুকাল পরে, সম্ভবতঃ সুনীলই লিখেছিলেন, "চারভোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয় পাপোষে"। অর্থাৎ বিদ্রোহী। বিদ্রোহ সমাজের প্রথাজীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে, এবং অংশত ঐতিহ্যেরও বিরুদ্ধে। সুনীলের এই বিদ্রোহের সুরই তাঁকে তৎকালীন যুবসমাজের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করেছিলো। এই বিদ্রোহ-প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো একধরণের পৌরুষ-চেতনা। রুক্ষ, পাথুরে, অমসৃণ পৌরুষচর্চার ফলে তাঁর কবিতায় কিছুটা ভাস্কর্যের গুণ আভাসিত হয়েছিল —যা তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের কবিতায় তেমন চোখে পড়েনি।

তার পরে অবশ্য দীর্ঘদিন কেটে গেছে, সুনীলের কবিতারও অনেক পালাবদল ঘটেছে, এবং সব মিলিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবি ব্যক্তিত্বকে এখন স্পষ্টভাবে চেনা যায়। সুনীল এখন তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছুতে পেরেছেন, এবং যে কোনো কবি বা কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে তা-ই একমাত্র কাম্য, কেননা **"A poet cannot be all things to all men, not even to truth. He can strive only to be himself—to himself"** (**Robert Penn Warren, Modern Poetry and the end of an era**)। কিন্তু পৌরুষ, রুক্ষতা, স্মার্টনেস, নাগরিকতা, এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য চরিত্রলক্ষণ সত্ত্বেও, সুনীল মুখ্যত একজন রোমান্টিক কবি। তিনি রোমান্টিক প্রধানত দুটি কারণের জন্য: এক, তাঁর নিরন্তর নারীবন্দনা, এবং নারীকে একাধারে সৌন্দর্যের আকর ও রহস্যময়ী করে তোলার প্রবণতা; দুই, সমস্ত অভিজ্ঞতার ওপরে তাঁর ব্যক্তি স্বরূপ ও **individualism**-কে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস। মানছি, সুনীলের কবিতায় এমন অনেক বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাকে যা আপাতদৃষ্টিতে আদৌ রোমান্টিক নয়, বরং তার বিপরীত, কিন্তু সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলে সংরক্ষিত থাকে একজন বিশেষ মানুষের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও **ego**। যে অর্থে ওয়াল্ট হুইটম্যান রোমান্টিক কবি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সেই অর্থে, রোমান্টিক। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সমস্ত কবিতা নিয়ে আলোচনা করা আমার অভিপ্রেত নয়,—এই পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীলের কবিতাগুচ্ছ সম্পর্কে মন্তব্য করাই আমার করণীয়।

প্রথম কবিতা 'এই দৃশ্যে' সুনীল নারী বন্দনা করেছেন, যা তিনি ইতিপূর্বে অন্তত আরো পঞ্চাশটি কবিতায় করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবিতাটি পড়তে খুবই ভালো লাগে। 'হাঁটুর ওপরে থুতনি', 'পায়ের আঙুলে লাল আভা' ইত্যাদি হয়তো **conventional** বর্ণনা, কিন্তু 'তর্জনিতে সামান্য কালির দাগ। একটু আগেই লিখছিলে'—লিখেই তিনি পুরো অভিজ্ঞতাটিকে একেবারে দৃষ্টিগোচর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে দিলেন। এই নারী আঙুলে কালি লাগালেও একাধারে **archetypal** ও চিরন্তন, কেননা পৃথিবীতে সব কিছুই পাল্টে পাল্টে যায়, 'নতুন মানুষ এসে' 'নতুন সমাজ'

গড়ে দেয়. কিন্তু এই অলস. উদাসীন নারীপ্রতিমাটির কোনো ক্ষয় নেই।

'সুধা. মনে আছে?'—কবিতাটিতে কবি জানাচ্ছেন যে তিনি তিনজন অমলকে চেনেন, যাঁরা কেউ ডাকঘরের অমল নয়—একজন প্রবাসী ও মদ্যপ. আরেকজন টালিগঞ্জ থেকে শিয়ালদায় আসে. এবং তৃতীয়জন বিদ্যালয়ের 'শব্দ সওদাগর'। কবিতাটির দ্বিতীয়াংশেই কিন্তু কবিতাটি পুরোপুরি শুরু হ'লো, যখন লেখক এমন বিষণ্ণ ও সুদূরভাবে প্রকৃতিকে বর্ণনা ক'রলেন যে আমাদের মনে হতে বাধ্য যে তিনিই 'ডাকঘরের' অমল (যদিও প্রত্যক্ষভাবে তা কোথাও বলা নেই)। 'জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াতেই টের পাই আমি বন্দী'—এই পংক্তিটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অমলের কথা মনে পড়ে। সুতরাং সর্বশেষ বিষণ্ণ প্রশ্নটিও ('সুধাও কি ভুলেছে আমাকে?) অনিবার্য প্রশ্ন।

তৃতীয় কবিতা 'শিল্প প্রদর্শনী'-তে কথঞ্চিৎ **irony** প্রশ্রয় পেয়েছে বলে মনে হয়। শিল্পীটি সুন্দরী, কিন্তু তাঁর তৈরী ভাস্কর্য হলো 'একটি কুৎসিত মূর্তি…"। শিল্পীকে সুন্দরী করার মধ্যেও সুনীলের নারীবন্দনাজনিত রোমান্টিকতা প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে যে সব টুকরো টুকরো কথোপকথনের বিবৃতি আছে, তাতে যে কোনো শিল্প-প্রদর্শনীতে সহজশ্রব্য অন্তঃসারহীন মন্তব্যের প্রতি কটাক্ষ আছে। এলিয়টের সেই বিখ্যাত পংক্তি দুটি মনে পড়ে : **In the room, the women come and go**
Talking about Michaelangelo.

'এ কার উদ্যানে?' কবিতাটি, এক হিসাবে, রোমান্টিক কবিতা। কেননা কবি আবিষ্কার করেছেন যে চারপাশে যে 'এই পটু লেকা, এই যুথী 'সমারোহ' তা 'সকলই আমার! ক্ষুধার্তের মতো আমি এই রূপ শুষে নিই নিজের শরীরে।' কবিতাটি আরো একটু ইংগিতময় হলে ভালো হতো —বক্তব্যের ওপর বড়ো বেশি জোর পড়েছে।

'মানুষের মুখ চিনে' কবিতাটি অপাতদৃষ্টিতে একটু অন্যধরণের কবিতা—তার কারণ সম্ভবত এই যে 'শুয়োরের বাচ্চা' তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। যারা সব কিছুর কলকাঠি নাড়ে, অথচ নিজেরা মুখোস প'রে থাকে এবং

'বিমানের সিঁড়ি থেকে পা পিছলে / একজনও পড়ে না', তাদের শূকর-সন্তান বলে সম্বোধন করে সুনীল ঠিকই করেছেন। মাঝেমাঝে, ক্রোধ ও ঘৃণা কবিতার পক্ষে খুবই জরুরি (দান্তে, ব্লেক স্মর্তব্য), এবং সুনীল এর আগেও এই ক্রোধ নিষ্কাষিত করেছেন অনেক কবিতায়। কিন্তু, লক্ষ্য করতে হবে, কবিতাটি শেষ হয়েছে রোমান্টিকতার জয়োৎসবে—রুসো-কথিত আদিম সমাজের পুনর্জাগরণের স্বপ্নে : গাও সভ্যতাবিহীন সেই জীবনের / নির্মল বন্দনা গান।

'জলের কিনারে' কবিতাটিতে বিষণ্ণতা ও রোমান্টিকতা—নাকি বলবো রোমান্টিক বিষণ্ণতা—আকীর্ণ হ'য়ে আছে। কবিতাটিতে ব্যাখ্যা করবার বিশেষ কিছু নেই, তবু এটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'তৃষ্ণার শান্তি নেই' জেনেও যে বারেবারে সমুদ্রকিনারে যেতে চায়, সে প্রকৃতপক্ষেই নিঃসঙ্গ এবং 'গৃহহারা'।

'কালো অক্ষরে' কবিতাটির মধ্যেও এই নিঃসঙ্গতা অনুরণিত। লেখককে সারাজীবন লিখেই যেতে হয় (অন্তত কোনো কোনো লেখককে), যদিও 'বাইরে আকাশ, বাইরে মধুর, বাইরে নারীরা'। লেখক সমস্তই বুঝতে পারেন, তাঁর 'হৃদয়ে প্রবাস', কিন্তু তাঁকে বারবার 'কালো অক্ষরের কালো শৃঙ্খলের' কাছেই ফিরে আসতে হয়। বাইরের দিক থেকে কোনো মিল নেই, কিন্তু বেদনার সমানুকম্পনের জন্যেই বোধ হয়—এই কবিতাটি পড়ে আমার টোমাস মানের "টোনিও ক্রোগার" গল্পটির কথা মনে হয়েছে। শেষ কবিতা "রূপ নারানের কূলে" খুব সুন্দর। 'নারীদের কারুর পা এই ধুলো মাটির পৃথিবী ছোঁয় না'—পংক্তিতে আবার সেই রোমান্টিকতা প্রকাশিত হয়েছে। পরের পংক্তির 'দৈব পিকনিক' শব্দদুটি খুবই অমোঘ। আরেক জন কবি রূপনারানের কূলে জেগে উঠেছেন বলে আমরা জানি, কিন্তু এই কবিতার লেখক প্রার্থনা করেছেন 'আমাকে জাগিও না'।

আটটি কবিতা আট রকমের হলেও, এদের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র আছে। সেই সূত্রটি হলো রোমান্টিকতা। বিশেষ অর্থে, রোমান্টিকতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আটটি কবিতা

এই দৃশ্য

হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
নীল ডুরে শাড়ী, স্বপ্নে পিঠের ওপরে চুল খোলা
বাতাসে অসংখ্য প্রজাপতি কিংবা সবই অভ্রফুল ?
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
চোখ দুটি বিখ্যাত সুদূর, পায়ের আঙুলে লাল আভা।
ডান হাতে, তর্জনিতে সামান্য কালির দাগ
একটু আগেই লিখছিলে
বাতাসে সুগন্ধ, কোথা যেন শুরু হলো সন্ধ্যারতি
অন্যদেশ থেকে আসে রাত্রি, আজ কিছু দেরি হবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
শিল্পের শিরায় আসে উত্তেজনা, শিল্পের দুচোখে
পোড়ে বাজি
মোহময় মিথ্যেগুলি শ্মশানে লুকোয়
যারা দুঃখ চিনেছিল, তারা ফের ভালো করে চেনে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
সময় থামে না, একদিন তুমি আমি সময়ে জড়াবো
সময় থামেনা, একদিন মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে
অতৃপ্ত বাসনা, ছোট ছোট সুখ, উড়ে যাবে
দিগন্ত পেরিয়ে
নতুন মানুষ এসে গড়ে দেবে নতুন সমাজ
নতুন বাতাস এসে মুছে দেবে পুরোনো বিশ্বাস,
তবু আজ
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
এই বসে থাকা, এই পিঠের ওপরে খোলা চুল,

আঙুলে কালির দাগ
এই দৃশ্য চিরকাল, এর সঙ্গে অমরতা সখ্য করে নেবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো···

সুধা, মনে আছে ?

তিনজন অমলকে চিনি, তারা কেউ ডাক ঘরের নয়
দুজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্যজন এখন বিদেশে
প্রবাসী অমল বেশ স্বাস্থ্যবান,
মদ্যপানে খুব নাম ডাক
আরেকজন টালিগঞ্জ থেকে রোজ শিয়ালদায় এসে
ঘড়ির দোকানে বসে
ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ঘোরে !
অপরটি বিদ্যালয়ে শব্দ সওদাগর
আমাকেও মাঝে মাঝে কুপিয়েছে জীবনের মানে
তার স্ত্রীকে দুপুরে একলা দেখি পার্ক স্ট্রিটে
সে কথা বলিনা।
তিনজন অমলকে চিনি, তারা কেউ ডাকঘরের নয়।

রূপালি পর্দার মত বৃষ্টি ওড়ে, ভোরবেলা ভেঙে যায় ঘুম
বাড়ির সামনের রাস্তা, এত চেনা, তবু যেন মনে হয়
চলে গেছে অনন্ত সন্ধানে
গাছগুলি বাউলের মত হাত বাড়িয়েছে
আকাশের দিকে
ফিরিওয়ালা আজ এক অন্য সুরে গান গেয়ে গেল
আমার চমক লাগে
একলক্ষ রোমে শিহরণ
জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াতেই টের পাই

আমি বন্দী
যা কিছু কাছের ছিল, সকলই অচেনা
আমার কথা কি কারো মনে আছে ?
সুধাও কি ভুলেছে আমাকে ?

শিল্প প্রদর্শনীতে

একটি কুৎসিত মূর্তি, সুবৃহৎ চৌকো চোখ
গালে পচা মাংস, অদ্ভুত বীভৎস ওষ্ঠাধর
শিল্পী এরকম গড়েছেন
আর ঠিক তার সামনে শাড়ী-মোড়া জীবন্ত সুন্দর !
টেবিলের পাশ থেকে শিল্পীটি এগিয়ে এসে
স্মিত হাসলেন
তৃতীয় ব্যক্তির দৌত্যে পরিচয় সাঙ্গ হলো চোখে চোখ রেখে
রমণীর বাঁ স্তনের ওপরে ব্যাগের স্ট্র্যাপ,
কটিতটে নদীর জোয়ার
আঁচলে সুগন্ধ, চিবুকের মসৃণতা রেশমের ঈর্ষা আনে
এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায়।

দুএকটি কথার পর পুনরায় দ্রষ্টব্যের দিকে মনোযোগ
'দারুণ' এ হেন শব্দে প্রশংসা ছটফট করে
'সভ্যতার খাঁটি রূপ শিল্পীর বলিষ্ঠ হাতে
যে-রকম বিমূর্ত হয়েছে···
'বিশেষত চোখে ঐ যে অসহায় আর্তনাদ '
বিনয়ে শিল্পীর ঘাড় নীচু, মুখখানি দুঃখী দুঃখী
কেন দীর্ঘশ্বাস পড়ে এ সময় ?
নারীর ভুরুতে দুটি মুক্তাবিন্দু সম ঘাম
এইমাত্র মুছেচে রুমাল

যেন দেবদূতী তার বিস্ময়ের উপহার দিয়েছে দ্রষ্টাকে
'চলুন চা খাওয়া যাক,' এই বলে এর পরে
সকলেই কান্টিনের দিকে···

এ কার উদ্যান ?

একার উদ্যান ? কে এত সযত্নে সাজিয়েছে
ফুলের কেয়ারি
সবুজ ঘাসের পাশে গোলাপ দুর্দান্ত লাল,
এবং মাধবী
কিশোরী মেয়ের মত সদ্য যৌবনের দিকে
হাত বাড়িয়েছে।
শিউলি ফুলের রাশি ঝরে আছে শৈশবের স্মৃতি
বিভিন্ন সুগন্ধ যেন ঝড় হয়ে ছুটে আসে ঘ্রাণে—
এ কার উদ্যান ?
এই পর্টুলেকা, এই যূথী সমারোহ ?

এ আমারই !
রেলিং-এর পাশে আমি দীন ভিখারির মতো
দাঁড়িয়ে রয়েছি
আমার এ পৃথিবীতে এক টুকরো ভূমি খণ্ড নেই।
তবু এই কুসুমের এমন উৎসব সাজ,
সৌরভের এই বন্যা—
সকলই আমার !
ক্ষুধার্তের মতো আমি এইরূপ শুষে নিই নিজের শরীরে।

মানুষের মুখ চিনে

শুয়োরের বাচ্চারাই সভ্যতার নামে জিতে গেল
ওদের নিজস্ব রাস্তা, ওরাই দৌড়োবে
ওদেরই মুখোস নিয়ে দেশে দেশে চলে যায় দূত
বিমানের সিঁড়ি থেকে পা পিছলে
একজনও পড়ে না !
বাঁধানো দাঁতের হাস্যে সভ্যতার নাম রটে যায়।

শুয়োরের বাচ্চাদের কৌতুক কাহিনী নিয়ে
ভরে যায় মহাফেজখানা
ওরাই নদীতে বাঁধে সেতু, ফের দুদিন বাদেই
ওদেরই নিজস্ব অস্ত্রে
সেতু ধ্বংস ছেলেখেলা হয় !
অন্যদিকে রক্তের নদীতে ভাসে সুদৃশ্য তরণী
সেখানে সঙ্গীত-সুরা, কঙ্কালের সঙ্গে
পাশা খেলে পুরোহিত
শুয়োরের বাচ্চাদের এই সভ্যতার গায় হিসি করে দাও ;

তুমি আমি কবিতায় ফিরে যাই আদিম জীবনে
গাও সভ্যতাবিহীন সেই জীবনের
নির্মল বন্দনা গান
অরণ্যে উলঙ্গ হয়ে অমলিন মায়াবী জ্যোৎস্নায়
হিম নীল আকাশের নীচে
মানুষের মুখ চিনে একদিন নাচের উৎসব শুরু হবে।

জলের কিনারে

এই অন্ধকার পথ চলে গেছে সমুদ্র কিনারে
যেখানে তৃষ্ণার কোন শান্তি নেই
তবু এই তৃষিতটি কেন ঐ পথে যেতে চায় ?

সকলেরই গৃহ আছে, সকলেরই নিজস্ব সীমানা
যেখানে অর্ধেক মৃত্যু অর্ধেক জীবন
তবু এই গৃহহারা কেন যায় জলের কিনারে ?

কালো অক্ষরে

কালো অক্ষরে থেকেছি মগ্ন সারাদিন সারা মাস ও
বছর
চোখ ক্ষয়ে গেল, বুক জ্বলে গেল, জুলপি ও চুলে
সাদা সাদা ছোপ
বাইরে আকাশ, বাইরে মধুর, বাইরে নারীরা
এই যে আয়ুর হনন, এই যে দিন দিনান্ত হৃদয়ে প্রবাস
এই যে পরের দুঃখ ও সুখ, যে যার খেলায়
রয়েছে মত্ত
কার নিশ্বাস, কার চাপা হাসি, চকিতে তাকাই
সকলই অলীক
শুধু কাছে থাকে কালো অক্ষর, সারাদিন সারামাস ও
বছর
কালো অক্ষর কালো শৃঙ্খল এক জীবনের ভ্রান্তি বিলাস
চোখ ক্ষয়ে গেল, বুক জ্বলে গেল, আয়ুর হনন,
হৃদয়ে প্রবাস।

রূপ নারানের কূলে

রূপনারানের কূলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
পৃথিবীতে নতুন চাঁদ উঠেছিল সেদিন,
অজানা ধাতুর মতন আভা
তার নীচে মধুলোভীদের দুরন্ত হুটোপুটি
নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য সিল্কের ওড়না
পাগল গলার গান দিগন্তকে কাছে নিয়ে আসে
নারীদের কারুর পা এই ধুলোমাটির পৃথিবী ছোঁয় না।
যেন আমরা এক দৈব পিকনিকে এসেছি
নতুন চাঁদের নীচে সেই এক নতুন রাত্রি
সেই পূর্ণকে শূন্য করার প্রতিযোগিতা, গোপন চুম্বন—
বাতাসের সুগন্ধ আমাকে অনুসরণ করিয়ে নিয়ে যায়
নদীর কিনারে বসে, অকস্মাৎ একা হয়ে, মনে পড়ে
এই খেলা ভেঙে যাবে!
অথচ জীবন এরকম সুস্বপ্ন হবার কথা ছিল
তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি এক হাত জলে ডুবিয়ে
তাকে সাক্ষী রেখে, ঘুমিয়ে পড়ি।

আমাকে জাগিও না!

অক্ষয় কুমার বড়াল

আলোক সরকার

অক্ষয়কুমার নিজেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। এই মনে করার ভিতরে কোনোরকম আবিলতা ছিলো না; অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি উদার অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন। তবু কবি-চরিত্রের দিক থেকে দুই কবির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান ছিলো। এই সূক্ষ্ম ব্যবধানকে বুঝতে পারলে একদিকে যেমন অক্ষয়কুমারের কবিস্বভাবকে বোঝা যাবে সেইরকম রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমারের পারস্পরিক ব্যবধানকেও, বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবার ভিতর দিয়ে অক্ষয়কুমার ব্যক্তিগত কাব্যভাবনারই প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার উভয়েই বিহারীলালের আবহাওয়ায় কবিতা রচনা শুরু করেন। কিন্তু মানসতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ যতটা বিহারী-লালের কাছাকাছি, অক্ষয়কুমার তেমন ছিলেন না। বিহারীলালের অতি-উচ্ছ্বাসী, মাঝেমাঝেই অসংযত ভাবনা-প্রক্ষোভকে, আবেগী তন্ময়তাকে কাটিয়ে উঠতে রবীন্দ্রনাথের সময় লেগেছিলো এবং কখনোই তিনি তাকে

পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বিহারীলালের কবিতার অন্তঃসারকে গ্রহণ করেও অক্ষয়কুমার কবিতার সংহতিকে কামনা করেছিলেন এবং এ-কাজে তাকে সহায়তা করেছিলো আবেগের পাশাপাশি একটা যুক্তিনির্ভর জিজ্ঞাসাউন্মুখ মন। এই মৌল ব্যবধান একই কেন্দ্র থেকে জন্মলাভ করলেও দুই কবিকে দুই ভিন্ন পথের সম্মুখীন করেছিলো। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতা অকপট আত্মময়, আত্মবৃত্ত থেকে পলায়নের উপায়ও যেমন নেই, ইচ্ছেও নেই ; বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের কবিতার বিশ্বচেতনা আত্ম-কেন্দ্র থেকে দেখা বিশ্বচেতনা। অক্ষয়কুমারের কবিতাও আত্মকেন্দ্রিক কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো তা নির্বিশেষ আত্মময় হয়ে ওঠে নি, অক্ষয়কুমার আবেগের ভিতর মিশে না গিয়ে তাকে কিছুটা দূর থেকে দেখতে জানতেন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে কবিস্বভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার উভয়েই ছিলেন রোম্যান্টিক কিন্তু বিহারীলাল অথবা রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক চেতনার পটভূমিতে যেখানে ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের কাব্যপরিমণ্ডল কাজ করেছিল, অক্ষয়কুমারের কবিতা পড়ে মনে হয় মানসতার দিক থেকে তিনি জর্মান রোম্যান্টিকদের ক্লাসিক রীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ভিতরে ভিতরে অনুভব করতেন না, যে কারণে গ্যয়টে নিজেকে ক্লাসিক ব'লে পরিচিত করতে চাইলেও, শীলার তাকে রোম্যান্টিকদের মধ্যে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। গ্যয়টে লিখেছেন, তিনি না চাইলেও আসলে যে তিনি রোম্যান্টিক এ-কথা শীলার প্রমাণ করেছেন। বস্তুত **Naive** এবং **Sentimental** দুই জাতের কবিতার কথা বলার পরও শীলার উভয়ের সমন্বয়ে রচিত **Synthetic** কবিতার উপর নজর দিয়েছিলেন। এবং শ্লেগেনভ্রাতাদের অন্যতম অগাস্টও মনে করতেন ক্লাসিক এবং রোম্যান্টিক সাহিত্যকে দুটো আলাদা ঘরে এনে বসবাস করানো যেতে পারে না। অগাস্টের ভাই ফ্রেডারিক রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী হননি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বিশেষ করে প্রথমদিকের কবিতা, আবেগসঞ্জাত এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ, জাত হিসেবে তার কবিতা শীলার কথিত **Sentimental** জাতের কবিতা, অক্ষয়কুমারের কবিতা **Synthetic** কবিতার কাছাকাছি, একই সঙ্গে **Naive** এবং **Sentimental**। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের এই মৌল ব্যবধান পরস্পরের

ভিতর একটা দূরত্ব এনেছিল এবং সেই কারণেই অক্ষয়কুমারের কবিতা-বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনই উৎসাহিত হননি, নিজের কাব্য-ধারণার উপর আস্থা রেখে অক্ষয়কুমারও নিজেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে 'তারকার আত্মহত্যা' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন, সেখানে মর্মের জলন্ত অঙ্গারকে আড়াল-করা অনিবার হাসির যন্ত্রণার অতৃপ্তিকে সহ্য করতে না পেরে একটি তারকা আত্মহত্যা করেছিল। শ্রীসুকুমার সেন অক্ষয়কুমারের 'রজনীর মৃত্যু' নামের কবিতাটির উপর 'তারকার আত্মহত্যা'র প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন,[১] কিন্তু 'তারকার আত্মহত্যা' এবং 'রজনীর মৃত্যু' বস্তুত ভিন্ন মেজাজের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যেখানে অন্তরের অগ্নিময় বেদনার দাহকে লুকিয়ে-রাখা বাইরের অবিচ্ছিন্ন হাসির মুখোশ, সুখের মুখোশের অতৃপ্তিকে জেনেছিলেন, অক্ষয়কুমার সেখানে প্রকৃতির অনিবার্য অপ্রতিহত নিয়মানুবর্তী যান্ত্রিকতাকে দেখে বিষাদ-ক্লান্ত হয়েছেন—প্রকৃতির কাছে জীবন এবং মৃত্যু সমমূল্য, ভালবাসা এবং প্রত্যাখ্যান, সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অবলুপ্তি। প্রকৃতির 'শ্মশান-হিয়ায়' সবকিছুই মিলিয়ে যায়। এই অনুষঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতাটির কথা', যেখানে সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতিকে মনে করা হয়েছে এমন এক শিকারী যে আমাদের সকলের জীবনকে নিয়ে তার শিকারের খেলা খেলে চলেছে—'প্রেম-প্রাণ-স্বপ্নের একটা ওলট পালট ধ্বংসের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন যেন সবদিকে।[২] 'রজনীর মৃত্যু' পড়তে পড়তেএকই রকম বোধ আমাদের ভিতরে কাজ করে।

'রজনীর মৃত্যু' নয়, রবীন্দ্রনাথের 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটির কথা মনে পড়তে পারে। অক্ষয়কুমারের 'দুর্বহ জীবন' কবিতাটির প্রসঙ্গে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতায় 'জলন্ত অঙ্গারখণ্ড' ('জলন্ত অঙ্গার-

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীসুকুমার সেন।

২ ক্যাম্পে : জীবনানন্দ দাশ : কবির স্বকৃত ব্যাখ্যা। শতভিষা একচত্বারিংশ সংকলন।

খণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি/অনিবার হাসিতেই রহে,/যত হাসে ততই সে দহে।') বলতে ঠিক কী ইঙ্গিত করেছেন জোর করে বলা যায় না, অক্ষয়কুমার 'দুর্বহ জীবন' কবিতায় যে সুখের দাহ অনুভব করেছেন তা অর্থহীনতার দাহ, উদ্দেশ্যহীনতার দাহ। রবীন্দ্রনাথ সব সুখের ভিতর, সব পরিপূর্ণতার ভিতর এক বেদনাকে অনুভব করেন, সে বেদনা অনির্দেশকে না-পাওয়ার বেদনা— 'সকল পাওয়ার মাঝে' আমার মনে বেদন বাজে নাই নাই নাই গো।' প্রমোদের ভিতর লীন হয়ে গিয়েও কেন তাঁর মন কেঁদে ওঠে তা তিনি বুঝতে পারেন না। এ-বেদনা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, অধরাকে না পাওয়ার বেদনা, যে বেদনার ভিতর শুনতে পাওয়া যায় সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী। অক্ষয়কুমারের বেদনার জাত একেবারেই আলাদা, বস্তুত তা বেদনা নয়, বিষাদ অবসাদ অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষের আর্তি :

যেন শূন্য-গর্ভ মেঘ নাহি গতি, নাহি বেগ
দীর্ঘ এক তন্দ্রার মতন !
পড়ে আছি স্তিমিত নয়ন !

পড়ে আছি স্তিমিত নয়ন।
নাহি শোক, নাহি তাপ নাহি পাপ, পরিতাপ
নাহি দুঃখ, রোগের তাড়ন,
নাহি অভাবের জ্বালা, সংসারের ঝালাপালা,
দারিদ্রের বৃশ্চিক-দংশন।
সুখের অভাব নাই তবু সুখ নাহি পাই
সুখে একি অসুখ-দহন !
কি দুর্বহ আমার জীবন।

(দুর্বহ জীবন : প্রদীপ)

'দুর্বহ জীবন' কবিতাটির পাশাপাশি জীবনানন্দের 'আট বছর আগের এক-দিন' কবিতাটির কথা মনে আনা যেতে পারে যেখানে নারীর হৃদয় প্রেম শিশু

গৃহ অর্থ কীর্তি স্বচ্ছলতার ভিতরেও মানুষকে আত্মহননের কথা ভাবতে হয়। এবং জীবনানন্দ তার কবিতার শেষদিকে যেমন জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার উপভোগ করে নেবার স্বপ্ন দেখেন, অক্ষয়কুমারও দুর্বহ জীবন কবিতার শেষে 'অকারণে দেহভার' বহন করার পীড়নকে সহ্য করতে না পেরে সুখ-দুঃখ আবর্তিত জীবনকে আকাঙ্খা করেন।

মেজাজের দিক থেকে অক্ষয়কুমার তার সমসাময়িকদের ভিতরে একে-বারেই স্বতন্ত্র ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যতই বলুন কামগন্ধহীন প্রেমে অক্ষয়কুমারের কোনো মাথাব্যথা ছিল না,[৩] তার পাঁচ বছরের অগ্রজ প্রতিম গোবিন্দচন্দ্র দাসের রক্ত-মাংসসহ প্রেম নিয়েও অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানোর প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রেমের ঊর্ধ্বে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের জয়গান রবীন্দ্রনাথ করেছেন, এ সমস্যা নিয়েও অক্ষয়কুমারের কোনো ভাবনা ছিল না। আসলে অক্ষয়কুমার প্রেমকে সহজ নিরপেক্ষ সংস্কারহীন চোখেই দেখতে চেয়েছিলেন এবং সেই কারণেই প্রেমিকাকে যেমন 'বিষাক্ত সর্পিনী' বলে সম্বোধন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল, সেইরকম নিজের ভিতরের পাপকে, কলুষকে চিনে নিতেও তার কষ্ট হয়নি। আমরা কি এইপ্রসঙ্গে বোদলেয়ারের কথা মনে আনবো? অংশত আনতেও পারি, আনলে ভুল হবে না। অংশত আনা যেতে পারে যদিও কবিস্বভারের দিক থেকে অক্ষয়কুমার এবং বোদলেয়ার ভিন্ন প্রকৃতির। অক্ষয়কুমার নিজের ভিতরের পাপকে, অন্ধকারকে নিজের মতো করে চিনেছিলেন :

কত যেন দোষী হয়ে কত যেন পাপ লয়ে
আসিয়াছি নিকটে তোমার !
যেন কি দুঃখের চিত্র যেন কী সুতীব্র বিষ
আনিয়াছি দিতে উপহার।

জ্বলন্ত নয়নে আছে যেন কি কলঙ্ক-লেখা
মুখ তুলে দেখিতে না চাও !

৩ 'প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা বা প্রস্তুতি : শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

আছে মোর রুদ্র কণ্ঠে মৃত্যুর আদেশ যেন,
দেব-কর্ণে শুনিবারে পাও !

আঁধারে মাথার পরে পরিণাম-নিশাচর
দাঁড়াইয়া পাখা বিস্তারিয়া,
দেখিতেছ তুমি যেন বর্তমান-মেঘ ঠেলি
সে আঁধার চিরিয়া চিরিয়া !

উদ্গার করিবে হৃদি কি অনল ধাতুস্রাব
চরাচর যাবে ছারখারে,
নিবাতে নারিব যেন ঢালি সপ্ত পারাবার
কিংবা তব চির-অশ্রুধারে !

জীবন আমার যেন বিকট শ্মশান-ভূমি
অন্ধ অমা রেখেছে আবরি,
তোমার নয়নপাতে ফুটিবে উষার আলো
এখনি জাগিবে হা-হা করি।

(প্রেমগীতি—১ : প্রদীপ)

'হা-হা করি' বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মনে রাখতে হবে অক্ষয়কুমার 'মানব-বন্দনা'-র মতো কবিতা লিখেছিলেন। কবিতা হিসেবে 'মানব বন্দনা' কতোটা সার্থক সে প্রশ্ন আলাদা, কিন্তু যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 'মানব-বন্দনা' বৈপ্লবিক এতে সন্দেহ নেই। বোঝা যায় অক্ষয়কুমারের যুক্তিনিষ্ঠ মন তাকে 'মানববন্দনা'র মতো কবিতা রচনার প্রেরণা দিয়েছিল। আবেগ নয়, এই যুক্তিশুদ্ধ মনই অক্ষয়কুমারের কবিতার ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে। এবং 'এষা', যে কাব্যগ্রন্থখানি বিপিনচন্দ্র পাল মনে করেন 'বিশ্ব সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইতে পারে।'[৪] কবিতা হিসেবে আধুনিক পাঠকের আর তেমন ভালো

৪ 'এষার' ভূমিকা : বিপিনচন্দ্র পাল।

না-লাগবার হলেও, তার 'বস্তুতন্ত্রতা' যে তৎকালীন কবিতার পরিবেশে একটি স্বতন্ত্র ঘোষণা, তাতে সন্দেহ নেই। দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অক্ষয়কুমার স্ত্রীবিয়োগবেদনার কাব্য লিখেছেন, কিন্তু তিনি যে তাদের ভিতর আলাদা একজন, এটা প্রমাণ করতেও তাকে কষ্ট করতে হয়নি।

ভাবনানির্ভর অক্ষয়কুমার যিনি মানুষের বিচ্ছিন্নতার কথা জেনেছিলেন, (হৃদয় সংগ্রাম : প্রদীপ), পাপের কথা জেনেছিলেন, জেনেছিলেন তাৎপর্যহীন অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনকে আধুনিক কবিতাপাঠক তাঁকে আবার পড়ে দেখতে পারেন।

অক্ষয় কুমারবড়ালের কবিতা

তর্কে

অবস্থার শিখরে উঠিয়া
অবস্থার গহ্বরে লুটিয়া
বুঝিয়াছি আমি যাহা তর্কে কি বুঝায় তাহা
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি
বুঝাইব কেমনে তোমারে ?
জীবন নহে ত সমভূমি
দেখিয়া লইবে একেবারে।

গান মোর

গান মোর নাহি যায় বুঝা
বলুক ; বলো না তুমি তুমি।
কে করেছে জীবন অবুঝা
অবুঝা সংসার, ধরাভূমি ?

সুরে মোর গরল-নিশ্বাস
বলুক ; ব'লো না গরবিনী !
হৃদয় কে জড়ায়ে রয়েছ ?
তুমি—তুমি বিষাক্ত সর্পিণী।

ফুলে

আঁখি তার—প্রভাত নলিন ;
বসোরার গোলাপ, কপোল ;
দেহ তার—শিরীষ-কুসুম

নব শষ্প ভার সে নিচোল।
মন তার ? ব'লো না আমারে,
ঢাক চিতা ঢাক ফুল-ভারে।

কোন দোষে

যাও তুমি চলিয়া যখন
পাশ দিয়া, ধীরে, হেলে দুলে ;
উথলি উছলি ওঠে মন,
পিছনে পিছনে যাই ভুলে।

চাও তুমি অমনি ফিরিয়া
চাহনি কঠোর অতি, রোষে।
সারাদিনে পাই না ভাবিয়া
আঁখি রাঙা , কোন্ দোষে ?

কেমনে

পারিব না মুহূর্ত বাঁচিতে
ভেবেছিনু, তাহার বিহনে।
বেঁচে আছি—তবু বেঁচে আছি
বেঁচে আছি বুঝি না কেমনে !

তুমি

আমার পিপাসা-অশ্রুজলে
কত ফুল পড়েছে ঝরিয়া !
আমার অতৃপ্তি-দীর্ঘশ্বাসে
কত পাখী গিয়াছে মরিয়া।

তুমি বন-কেতকি ! টুক্‌টুক !
কেন তুমি এসেছ এখানে ?
করিতে কি দণ্ড দুই লীলা
অশ্রুজলে, দীর্ঘশ্বাসে, গানে ?

প্রেম-গীতি (২)

তাই তুমি ঘৃণা কর ভীত হ'য়ে যাও সরে
মোর শ্বাস পাছে লাগে গায় ?
কি ছিলাম-কি হয়েছি কেন যে বাঁচিয়া আছি
দেখা না, কেমনে দিন যায় !

শুন তবে রমণী রে বলি আজি গর্ব-ভরে
এ প্রণয় স্বার্থ-শূন্য নয় ;
জনম-বিফল ব্যর্থ এ স্বার্থ না হ'লে পূর্ণ ;
এ প্রণয় মহাস্বার্থময় !

বিভাব

শরীরে অভাব আছে হৃদয়ে অভাব আছে
জীবন অভাব আছে মোর,
অভাব রয়েছে সুখে, অভাব রয়েছে দুখে
মরণে অভাব আছে ঘোর !

লইয়া অভাব এত লইয়া এ মহাশূন্য
আসিয়াছি নিকটে তোমার !
যতটুকু পার-দাও, হয় হোক বিন্দুমাত্র,
পূরাতে এ শুষ্ক পারাবার !

অবশিষ্ট অপূর্ণতা লবে প্রেম পূর্ণ করি
দিয়া নিজ কল্পনা স্বপন।
তুচ্ছ প্রেমিকের আশা ঘোরে না বিধির চক্র
মূলে না রহিলে একজন।

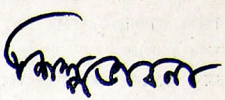

সিনেমার দুই ধারা

মৃগাঙ্কশেখর রায়

সিনেমার জন্ম থেকেই এই শিল্পমাধ্যমের বিবর্তনে দুটি বিভিন্নমুখী ধারার দেখা মেলে। এই দুটি ধারা হয়ত ভিন্নপথে চলতে চলতে কখনো কখনো একসঙ্গে মিশেছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে চলচ্চিত্রের এই দুটি ধারাকে বিশেষজ্ঞরা আলাদা করেই বিচার করেন। এই দুটি ধারার একটি হচ্ছে কাহিনীচিত্র ও আর একটি হচ্ছে প্রামাণ্য চিত্র।

সিনেমার আদিযুগে এই দুটি ধারার তফাৎটা ছিল খুব বেশি। অবশ্য সিনেমার শুরুই হয়েছে বাস্তব জীবনের নানা ব্যাপারের চিত্ররূপায়ণের মাধ্যমে। লুমিয়ের ভাইয়েরা স্টেশনে ট্রেণ আসার ছবি তুললেন, কারখানার ছুটির পর লোকেরা হুড়মুড় করে বেরোচ্ছে, কিংবা বাগানে জল দেওয়া হচ্ছে, এ সবই হল দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখের সামনে যা ঘটছে, তাকে বায়স্কোপের পর্দায় তুলে ধরা। এর মধ্যে কোন বানানো জিনিস ছিল না। কিংবা এই সব ঘটনাকে অবলম্বন করে কোন গল্প তৈরী করবারও চেষ্টা ছিল না। কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীও অংশ নিতনা এই সব ছবিতে। তা সত্ত্বেও কিন্তু তৎকালীন দর্শকেরা এইসব ছবি দেখে

খুবই মজা পেতো। আসলে প্রতিদিন যেসব ঘটনা চোখের সামনে ঘটছে, সেগুলোই আবার বায়োস্কোপের পর্দায় দেখার মধ্যে একটা আলাদা উত্তেজনা ও আনন্দ ছিল। ছবি যে নড়েচড়ে, বা ঘরের মধ্যে বসেই যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কী ঘটছে সেটা দেখা যায়, এটাই প্রথমদিকে সিনেমার দর্শকদের কাছে একটা আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হত। তাছাড়া দর্শকদের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিজেদেরকে পর্দার ওপরে দেখতে পেত। তাই সব কারণেই আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারটা অনেক সহজ ছিল এবং এই জন্যেই এই সব টুকরো টুকরো ছবি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল আর কোন প্রমোদোপকরণ না থাকা সত্ত্বেও। এই উত্তেজনা যে কি প্রচণ্ড হতে পারে, একটা গল্প বললেই সেটা বোঝা যাবে। লুমিয়ের-এর ছবির প্রথম প্রদর্শনীতে যখন স্টেশনে ট্রেণ আসার দৃশ্য দেখান হয়, তখন দর্শকদের মধ্যে তুমুল সোরগোল পড়ে যায়। পর্দার ওপরে ট্রেণ যখন এগিয়ে আসছে, তখন দর্শকেরা ভাবলো বুঝি ট্রেনটা তাদের ঘাড়ের ওপরই এসে পড়লো। তাই পড়ি কি মরি করে বাইরে পালানোর জন্যে হুটোপুটি পড়ে যায়। পরে অবশ্য বহু কষ্টে তাদের শান্ত করা হয় এই বুঝিয়ে যে ওটা আসল ট্রেন নয়, ট্রেনের ছবি মাত্র। এ থেকেই বোঝা যাবে যে বাস্তব জীবনের ছবির সাথে দর্শকের একাত্মতাবোধ কতটা বেশি। এখনও অনেক জায়গায়, বিশেষ করে সুদূর গ্রামাঞ্চলে সিনেমা দেখাবার সময় এরকম মজার অভিজ্ঞতা হয়। বর্তমান লেখকের একবার উত্তরবঙ্গের এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর একটা তথ্যচিত্র তৈরী করার সময়কার অভিজ্ঞতাও কৌতুকাবহ। ছবিটা শেষ হবার পর যখন সেই আদিবাসীদের গ্রামে তার প্রদর্শনী হল, তখন ছবি দেখে তাদের সে কী উল্লাস। কারণ তারা তো নিজেদেরই দেখছিল পর্দার ওপরে। প্রথম আয়নায় নিজের ছায়া দেখলে যেরকম মজা লাগে, এটাও অনেকটা সেরকমই। এরকম আরও বহু উদাহরণ আছে। ফ্ল্যাহার্টি যখন এস্কিমোদের নিয়ে তোলা ছবি "নানুক অফ দি নর্থ" (নানুক নামে একজন এস্কিমো এ ছবির নায়ক আর তারই জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত এছবিতে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে দৈনন্দিন সংগ্রাম করে এস্কিমোরা যে টিকে আছে, ফ্ল্যাহার্টি তাই দেখিয়েছেন) যখন

পরিচালক এস্কিমোদের প্রথম দেখালেন, তখন তাঁর একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আসলে বাস্তবের হুবহু প্রতিরূপ সিনেমায় দেখার একটা আলাদা উত্তেজনা আছে। ইদানীংকালে টেলিভিশনের আকর্ষণের মূল কারণ অনেকটাই তাই।

কিন্তু বাস্তব ঘটনার চিত্ররূপ দিয়ে সিনেমার শুরু হলেও, আস্তে আস্তে ধারা পাল্টাতে লাগল। আসলে রোজকার জীবনের ঘটনাগুলোর পর্দার ওপর প্রক্ষেপণের তাৎক্ষণিক মজাটা কিছুদিনের মধ্যেই উবে যেতে লাগল। ট্রেন চলছে, ঘোড়া ছুটছে কিংবা জলে জাহাজ ভাসছে, এইসব ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবিতে অল্পদিনের মধ্যেই দর্শকের অরুচি ধরে গেল। তারা তখন ছবিতে চাইল আরো কিছু উপাদান ; শুধু বাস্তব ঘটনার রিপোর্ট নয়, সেইসব ঘটনাকে অবলম্বন করে, ঘটনার ওপর কল্পনার রং-চড়ানো নাটক আর গল্প। আদিযুগের চলচ্চিত্রনির্মাতারাও অবশ্য দর্শকদের এই চাহিদার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বাস্তবের দলিল রূপায়ণের মধ্যেও তাঁরা মাঝে মাঝে অন্য উপকরণের আমদানি করেছিলেন। গোড়ার দিকের ছবিগুলোর মধ্যে দুটো ছবির নাম করা যায়, যাতে শুধুমাত্র বাস্তব ঘটনার রূপায়ণ ছাড়াও অন্য একটা মাত্রা সংযোজনের চেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে দর্শকদের মজা আর একটু বাড়ে। এরকম একটা ছবির নাম হচ্ছে "হাঁচি।" নাম শুনেই বোঝা যাবে যে ছবির রকমটা কেমন। আসলে ব্যাপারটা কিছুই না, একজন লোক হাঁচবার চেষ্টা করছে। ক্যামেরা স্থির, লোকটির বিভিন্ন মুখভঙ্গিই ছবির উপাদান। ক্লোজ-আপে ধরা লোকটির মুখ, হাঁচির চেষ্টা, তারপর প্রবল বেগে হাঁচির তোড়, ব্যস্, এই হল মোদ্দা ছবির ব্যাপার। কিন্তু বাস্তব ঘটনার প্রতিরূপের বাইরেও এই ছবিতেই প্রথম দেখা যায় খানিকটা আতিশয্যের ব্যাপার আছে, যার ফলে এ ছবির রসটা খানিকটা আলাদা জাতের। বস্তুতপক্ষে, এই ছবিতেই স্ল্যাপষ্টিক কমেডির প্রথম পদক্ষেপ। লোকটি হাঁচছে, এটা বাস্তব ঘটনা ; কিন্তু সেই ঘটনার ওপর রং চড়িয়ে, নানা অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে একটা কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, চিত্রনাট্যের ভাষায় যাকে সিচুয়েশন বলা যায়। পরবর্তী-কালে এই রকম সিচুয়েশনের সমাহারেই সিনেমার গল্প তৈরী হয়। এই

ধরণের আর একটি ছবির নাম "চুম্বন।" এই ছবিতেই সিনেমার প্রথম নায়ক-নায়িকার আবির্ভাব বলে ধরা হয়। মিনিট দেড়েক ব্যাপী এক চুম্বনদৃশ্যের ছবি ; ক্যামেরার কায়দা কিছুই নেই, শুধু স্ত্রী-পুরুষ দুজনকে সোজা ধরা আছে আর তাদের চুম্বনদৃশ্যের মধ্যে কিছুটা রোমান্টিক আবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টার আভাস। এখানে ঘটনার রিপোর্ট ছাড়াও আর একটা স্তরের ব্যাপার আছে। এরকম ভাবেই ধীরে ধীরে সিনেমার ধারা বদলাতে শুরু করে। দর্শক গল্প চাইতে আরম্ভ করল। ঘটনার মধ্যে নাটকীয়তা দাবি করল আর চলচ্চিত্র নির্মাতারাও তাঁদের ছবি তৈরীর ধরণ পাল্টাতে শুরু করলেন। মজার কথা এই যে গল্প তৈরি করার মধ্যেও কিন্তু দুরকমের মেজাজ কাজ করেছিল। আমেরিকায় যাঁরা প্রথম কাহিনীচিত্র তৈরী করা শুরু করেন, তারা দৈনন্দিন বাস্তবকে অবলম্বন করেই তাঁদের ছবির গল্প তৈরি করেছিলেন। যেমন এডুইন পোর্টারের "দি গ্রেট ট্রেন রবারি" (এই ছবিতেই প্রথম একটা গোটা গল্প বলা হয়)। কিংবা গ্রিফিথের "দি লোনলি ভিলা" বা "এ কর্নার ইন হুইট"। এমন কি কমেডি ছবিতেও ঘটনার ব্যাপারটা একেবারেই বাস্তবনির্ভর ছিল। কিন্তু এই বাস্তবমুখী ধারার একটা বিপরীত গতিও সিনেমার গল্পের জন্মের সুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সেটা হচ্ছে রূপকথা ও ফ্যান্টাসি নির্ভর কাহিনী, বাস্তব থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক স্বপ্নের জগৎ তৈরির চেষ্টা। লুমিয়ের যেমন চলচ্চিত্রে বাস্তবতার প্রথম সূত্রপাত করেন, মেলিয়ে তেমন তাঁর ছবিগুলোতে এক অলীক কল্পনার পরিবেশ গড়ে তোলেন। সুতরাং গোড়া থেকেই সিনেমার বিবর্তনের এই দুটো আলাদা চেহারা ধরা পড়ে। প্রামাণ্যচিত্র চলচ্চিত্রের এই বাস্তবমুখী ধারাকেই আরো প্রাণবন্ত করে তোলে।

এখন দেখা যেতে পারে যে ডকুমেন্টারী আর কাহিনীচিত্রের মধ্যে মোটামুটি পার্থক্য কী? প্রথমে মৌলিক তফাৎগুলো নিয়ে আলোচনা করে তারপর প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে সত্যি সত্যিই তফাৎ কিছু আছে কি না।

শব্দগত অর্থ ধরলে অবশ্য যে কোনো ধরণের তথ্যচিত্র বা সংবাদচিত্রকেই ডকুমেন্টারির কোঠায় ফেলতে হয়। কিন্তু সংবাদচিত্র শুধুমাত্র বিবরণ। শুধু বাস্তব দৃশ্যাবলীর সম্পাদিত সমাবেশ, এক ধরণের ক্যামেরা-রিপোর্টাজ।

ডকুমেন্টারিতে আমরা পাই বাস্তব জীবনের বিভিন্ন উপাদানের শিল্পসম্মত সংগঠন ও তার সামাজিক ব্যাখ্যা। কিন্তু শুধুমাত্র বাস্তব পরিবেশ ও পটভূমিকা তৈরিই কি ডকুমেন্টারির বৈশিষ্ট্য? বহু কাহিনীচিত্রেও আমরা স্টুডিও বর্ণিত বাস্তব পরিবেশের পরিচয় পাই। চলচ্চিত্রের আদিম যুগেও গ্রিফিথ তাঁর "ওয়ে ডাউন ইস্ট"এ বরফ ও পাহাড়ের বাস্তব চিত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং একটি সুইডিশ ছবিতে চরিত্রের মানসিক আলোড়ন বোঝাতে গিয়ে বাইরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রকৃতির চিত্র সংযোজিত হয়েছিল। বাস্তব পটভূমিকা ব্যবহারে ওয়েস্টার্ন ছবিগুলির কৃতিত্বও কম নয়। যদি বাস্তব জীবনের চিত্রণই ডকুমেন্টারির লক্ষণ হয় তবে সে দাবি বহু নামকরা কাহিনীচিত্রেরও, যেসব ছবিতে সৎশিল্পের প্রকৃতিগত জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় বিধৃত। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে ডকুমেন্টারি হচ্ছে বাস্তবের প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ এবং কাহিনীচিত্রের জীবনের রূপ অপ্রত্যক্ষভাবে শিল্পরসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত ডকুমেন্টারি চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত বা মানবমতের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের প্রক্ষেপণ অনুপস্থিত। তৃতীয়ত, ডকুমেন্টারিতে কোন কেন্দ্রচরিত্রের স্থান নেই এবং সমস্ত মানুষের সমবায়ে গঠিত জীবনসত্তার সামগ্রিক অন্বেষণই ডকুমেন্টারির লক্ষ্য।

চলচ্চিত্র-আঙ্গিকের প্রাথমিক সূত্রগুলি পালন করা ছাড়াও ডকুমেন্টারির কতকগুলি বিশেষ নীতি আছে। দৈনন্দিন বাস্তব থেকে দূরে সরে গিয়ে জীবনসংগ্রামকে এড়িয়ে যাওয়া ডকুমেন্টারির আদর্শ নয়। জীবনের মধ্যে থেকে জীবন সংগ্রামের যে কাব্য, তার সৌন্দর্য্য, তার মানসিক আবেদন এগুলিই ডকুমেন্টারির বিষয়বস্তু। তাই ডকুমেন্টারির উপাদান, কাহিনী, সবই বাস্তব জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে। স্টুডিও-জাত বাস্তবের অনুকৃতি কিংবা পেশাদারী অভিনেতার আয়ত্ত অভিনয়কৌশল এখানে অচল। যে জীবনের চিত্র গ্রহণ করা হবে, চিত্রনির্মাতাকে সেই জীবনের অংশীদার হয়ে তার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে ; তার সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার ভাগ নিতে হবে। ডকুমেন্টারির বিশেষ কোন বাঁধাধরা চিত্রনাট্য না থাকলেও চলে। কারণ, চিত্রগ্রহণের সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলোর অন্তর্ভুক্তি ছবির বাস্তবতা বাড়িয়ে দেয়। এমন কি, লিখিত সংলাপের বদলে চিত্রায়িত

জীবনের ঘরোয়া কথাবার্তা ব্যবহার করলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। এই প্রত্যক্ষ জীবনসত্যের উপলব্ধি ও তার অভিব্যক্তিই ডকুমেন্টারির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এখানেই কাহিনীচিত্রের সঙ্গে তার একটা বড় পার্থক্য। কাহিনীচিত্রে আমরা যা দেখি, তার সবটাই বানানো। যে অভিনেতা যে চরিত্রের রূপদান করছে, বাস্তব জীবনে সে তা নয়। গল্পের মধ্যেও অনেকটাই কল্পনার রং-ছড়ানো। কাহিনীচিত্রের নিজস্ব শৈল্পিক প্রয়োজনেই তাকে এভাবে মায়ানির্ভর হতে হয়। কিন্তু ডকুমেন্টারি ঠিক তার উল্টো। দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, একটি বিখ্যাত কাহিনীচিত্র ও একটি বিখ্যাত ডকুমেন্টারির কথা। আইজেনস্টাইনের "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন" ও হল্যাণ্ডের জোরিস্ ইভেনস্-এর "দি স্প্যানিশ আর্থ।" প্রথমটি উনিশশো পাঁচ সালে রাশিয়ার বিদ্রোহের সময় জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ওডেসার জনতা ও প্রোটেমকিন যুদ্ধজাহাজের সম্মিলিত সংগ্রামের কাহিনী। আর দ্বিতীয়টি স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়কার প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রায় প্রামাণ্য চিত্র (যদিও পরে কিছু "অভিনীত" দৃশ্য এই ছবিতে নেওয়া হয়)। দুটিই বিদ্রোহী সংগ্রামের ছবি। কিন্তু প্রথম ছবিটির পাত্রপাত্রীরা কেউই বাস্তব জীবনে সেই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি বা চিত্রোক্ত ঘটনাগুলোও তাদের জীবনে সত্যি সত্যি ঘটেনি। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটিতে যে সৈন্যরা যুদ্ধ করছে বা যারা বন্দুকের গুলিতে মারা যাচ্ছে, চিত্রোল্লিখিত ঘটনাগুলি তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই রূপায়ণ। কিন্তু পরিবেশ বা চরিত্রের সত্যতা রক্ষা ছাড়াও ডকুমেন্টারির আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ধরা যাক খাদ্য সমস্যা নিয়ে একটি কাহিনী চিত্র ডকুমেন্টারি তৈরি হবে। এক্ষেত্রে কাহিনী চিত্রের পরিচালক কোন পথে এগোবেন এবং ডকুমেন্টারি-পরিচালকই বা কী নীতি অনুসরণ করবেন? কাহিনীচিত্রের নির্মাতা সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ঘটনা বেছে নেবেন ও কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করবেন। তারপর সেই ঘটনা ও চরিত্রগুলি নিয়ে একটি সংবদ্ধ কাহিনী রচনা করবেন। সেখানে খাদ্যসমস্যা নিশ্চয়ই পটভূমিকা হিসেবে থাকবে, কিন্তু মুখ্য হবে ঐ চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবনের ওপর সমস্যাটির প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়া এবং এর ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোড়ন। বিশদ করে বলতে গেলে চরিত্র-

গুলি এবং তাদের কেন্দ্র করে কাহিনীটির ক্রমবিকাশ ও পরিণতির সহায়করূপে পটভূমিকাটি ব্যবহৃত হবে। কিন্তু ডকুমেন্টারির রীতি আলাদা। এখানে পরিচালক খাদ্যসমস্যার বিষয়টির বাস্তবরূপ দেবার জন্য যে উপাদান প্রয়োজন সেগুলি নির্বাচন করে সমস্যাটির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করবেন।

ডকুমেন্টারির আরও কয়েকটি বিশিষ্ট দায়িত্ব আছে। এই ধরণের ছবিতে এমন অনেক বিষয় ব্যবহৃত, আপাতদৃষ্টিতে যেগুলোর শিল্পসম্ভাবনা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। যেমন ডাকঘর, রেলপথ, কলকারখানা ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হল, কী করে এই উপাদানগুলির শিল্পরূপ দেওয়া সম্ভব। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত জিনিষের মধ্যেই স্বকীয় একটা ছন্দ আছে এবং বিশিষ্ট আঙ্গিকের সাহায্যে ঐ ছন্দের মর্মোদ্ঘাটনেই থাকে শিল্পত্ব। যাঁরা লোহার ব্যবহার নিয়ে তোলা ভারত সরকারের ডকুমেন্টারিটি কিংবা ইংলণ্ডের রোনাল্ড রীলের 'স্টীল' ছবিটি দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন কীভাবে ক্যামেরা-সংস্থান, যথোচিত আলোকসম্পাত ও সম্পাদনার সাহায্যে কারখানার যন্ত্রপাতি এমন কি লৌহপিণ্ডগুলিকেও জীবন্তরূপ দেওয়া হয়েছে। আবার হ্যারি ওয়াটের "নাইট মেল" ছবিতে শব্দ-সার্থক সমাহার (ট্রেনের চাকার শব্দের সঙ্গে নেপথ্যভাষ্যে অডেন-পঠিত কবিতার ছন্দোবদ্ধ সঙ্গতি) আমাদের চোখ এড়ায় না। আবার দৃষ্টান্ত ধরা যেতে পারে একটা বড় শহরের জীবনযাত্রার রূপ। পথে-ঘাটে, লোকের ভিড়ে, হাবভাবে যে ক্ষান্তিহীন ভাবতরঙ্গের উন্মেষ বিচিত্র ছন্দে দোলায়িত, তার যে মহাসঙ্গীত, তার যথাযথ রূপারোপই ডকুমেন্টারির কাম্য। কীভাবে কোন বিশেষ ভঙ্গিতে সেই রূপের চিত্রায়ন হবে সেটা অবশ্যই পরিচালকের নিজস্ব মেজাজ ও ধারণার ওপর নির্ভর করে। যেমন, কলকাতার গৃহসমস্যা নিয়ে একজন পরিচালক নানাভাবে ছবি তৈরি করতে পারেন। তিনি কয়েকটি বিশিষ্ট নির্বাচিত চিত্রকল্পের সাহায্যে সমস্যাটির রূপায়ণ করতে পারেন (যেমন ছবিটির আরম্ভ হতে পারে পরিত্যক্ত গ্যাসপোস্টে পায়রার বাসার দৃশ্যের সঙ্গে সংযোজিত কলকাতার ঘিঞ্জি ফ্ল্যাট-বাড়ির দৃশ্য দিয়ে), কিংবা একটি পরিবারের গৃহসমস্যাকে কেন্দ্র করে ছবিটি এগিয়ে যেতে পারে। আবার ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার নিয়ে নানা

লোকের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমস্যাটির একটি প্রত্যক্ষ সাংবাদিক বিবরণ যোগাড় করা যেতে পারে (ইংলণ্ডের "হাউসিং প্রবলেমস" ছবিটিতে যা করা হয়েছিল বা ইদানীংকার "সিনেমা ভেরিতে" জাতীয় ছবিগুলির যা ধরণ)। এরকম নানা বিকল্পের মধ্যে ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রকার যে কোন একটি বেছে নিতে পারেন। তবে লক্ষ রাখতে হবে যে বিষয়বস্তুর ছন্দ বা তার বাইরের দৃশ্যসৌষ্ঠবের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত অর্থ, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থান এবং তার বাস্তব প্রয়োজনের দিকটাও যেন অবহেলিত না হয়। এজন্যই ডকুমেন্টারির ভঙ্গি হবে সরল। ডকুমেন্টারিতে আঙ্গিক-বাহুল্য অসুবিধে ত্রিবিধ। ডকুমেন্টারি নির্মাতার সবসময়েই মনে রাখা দরকার যে তাঁর দর্শক শুধুমাত্র বিদগ্ধসমাজ থেকেই আসবেন না, তারা আসবেন জীবনের এমন অনেক ক্ষেত্র থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি যেখানে অনধিগত। দ্বিতীয়ত; অতিমাত্রায় দৃশ্যসৌকর্য বা আঙ্গিক বিন্যাসের ফলে সংকেত-বাহুল্য এসে যায়। কারখানার চেহারা দেখাতে গিয়ে আকাশের পটভূমিকায় চিম্‌নির ছবি, শক্তির রূপ হিসেবে ঘূর্ণ্যমান চাকার ব্যবহার, শহরের ব্যস্ত জীবনযাত্রা বোঝাতে গিয়ে দ্রুত ধাবমান ট্রাম-বাসের চিত্রসমাবেশ, এধরণের প্রতীকের অতিব্যবহার বিরক্তি-কর। তৃতীয়ত, ডকুমেন্টারি যে কেবল একটি শিল্পমাধ্যম তাই নয়, এর সামাজিক প্রয়োজন ও দায়িত্বও প্রচুর। ব্যবহারিক জীবনের নানা সমস্যার চিত্রণের দায়িত্ব ডকুমেন্টারির। শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলালে সেই সমস্যার আসল রূপ চাপা পড়ে এবং জীবন-ভাষ্যের রূপায়ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

সিনেমা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই অবশ্য তার বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যেকার তফাৎ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। কমবেশি সব শিল্পমাধ্যমের অগ্রগতির ইতিহাসে অবশ্য এই ধরণের ইঙ্গিতই দেখা যায়। গদ্যরচনায়ও কবিতার চিত্রকল্প ব্যবহার হচ্ছে, আবার কবিতার বিন্যাসেও গদ্যের ঋজু ভঙ্গির আমদানী দেখা যাচ্ছে। থিয়েটারে বহু সময়েই সিনেমা, সঙ্গীতের আঙ্গিক চালু হচ্ছে। এরকমভাবে আস্তে আস্তে ডকুমেন্টারি ও কাহিনী-চিত্রের ফারাক্‌ও কমে আসছে। আসলে সিনেমার বাস্তবমুখী ধারাটি যত শক্তিশালী, চলচ্চিত্র দর্শক-মনোরঞ্জনী ফাঁপা প্রমোদকরণ থেকে সরে এসে

যত জীবনের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে, ততই ডকুমেন্টারি ও কাহিনীচিত্র এক লক্ষ্যে এসে মিশছে। ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রকার ও কাহিনীচিত্রকারের উদ্দেশ্য এখন তাই প্রায় এক। সমাজকে বিশ্লেষণ করা, নানা সামাজিক অসঙ্গতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমাধানের সঠিক পথ নির্ণয়। এর জন্যে দরকার হলে কিছুটা সরব হলেও রসহানির কোন ভয় নেই। কারণ আজকের যুগে সিনেমা আর প্রেমিক-প্রেমিকার অলস অবসর যাপনের উপকরণ নয়, সিনেমা এখন সমাজ ইতিহাসের পালাবদলের অন্যতম নিয়ামকও বটে।

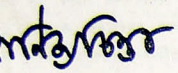

অর্থচিন্তা

উৎপাদন উৎপাদন

মণীশ নন্দী

একথা নির্বোধেও মানবে যে দরিদ্র দেশে ধন উৎপাদনই বেশী জরুরি। যে দেশে শতকরা চল্লিশ জন লোক সুস্থ মানুষের উপযোগী অন্নসংস্থানই করে উঠতে পারেনা, সেখানে কত জরুরি বলাই বাহুল্য। সময় বিশেষে উৎপাদনের ধুয়ো হয়ত বেশি সরব হয়, নেতাদের বক্তৃতায় আর সম্পাদকদের স্তম্ভে হয়ত উল্লেখ জনপ্রিয় হয়, কিন্তু আসল ব্যাপারটা অপরিবর্তিত থাকে। অভুক্ত লোক খেতে চায়; বিবস্ত্র মানুষ চায় কাপড়জামা; যে বাস্তুহীন সে আশ্রয় চায়। প্রয়োজন: উৎপাদন।

প্রয়োজনটা, যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই, এমনভাবে আমাদের মগজে শিকড় গেড়েছে যে সেটা মেটানোতে আমাদের প্রস্তুতি না হোক, প্রবণতা সর্বাত্মক। যে করেই হোক উৎপাদন বাড়াতে হবে, যজ্ঞের আগুন আরো বিস্তৃত করতে হবে। আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার কয়েকটা দিক তলিয়ে দেখলেই এটা স্পষ্ট হবে।

ধরা যাক, কারখানায় নিরাপত্তা। একজন শ্রমিক নিরাপদে তার কাজ করতে পারবে, এটা ন্যূনতম প্রত্যাশা। কাজের জন্যে কারো অঙ্গহানি বা

জীবনহানি ঘটল, এটা কোনো সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জাকর। তাই যদি হয়, স্বাধীনতার পর শ্রমিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনেক কড়াকড়ি হওয়া স্বাভাবিক ছিল বা কারখানায় দুর্ঘটনার হারের নাটকীয় অধোগতি ঘটা উচিত ছিল। তেমন কিছু ঘটেনি। ঘটেনি এইজন্যেই যে আমাদের ভয়, তেমন কড়াকড়িতে উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটতে পারে, আমাদের প্রধান লক্ষ্যের দিকে যাত্রা মন্থর হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ কয়েকটি ভাঙা হাত পা বা মাথার মূল্যে আমরা কয়েক টন ইস্পাত বা কয়েক গ্যালন তেল কিনতে রাজি আছি।

কিংবা নেওয়া যাক জীবন-সংরক্ষক ওষুধের দামের কথা। ক্ষীণতম ওজুহাতে অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এসব ওষুধের দাম বাড়িয়ে, যাদের এগুলির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেই সমস্ত অপুষ্ট নিম্নবিত্ত মানুষের নাগালের প্রায় বাইরে নিয়ে এসেছে এর ব্যবহার। এই মূল্যবৃদ্ধি স্পষ্টত অযৌক্তিক এবং যেহেতু এর প্রণেতারা স্বল্পসংখ্যক, সহজেই এর প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করা যেত। কিন্তু করা হয়নি, কেন? এখানেও কাজ করছে সেই আতঙ্ক; উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটবে। আবার ব্যাখ্যা করছি: উৎপাদনের মূল্য হিসেবে এখানে আমরা কিছু উৎপাদককে অবাধ লুণ্ঠণের অনুমতি দিতে রাজি আছি। 'রাজি আছি' বাড়িয়ে বললাম। মানুষ অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত নেয় দ্বিধায়। অনিচ্ছায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপারটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, স্পষ্টভাবে সবকিছু ভেবে, তিক্ত উপসংহারে পৌঁছনোর বিতৃষ্ণা আমাদের অনড় করে। আমাদের সিদ্ধান্তহীনতাই তখন একটি সামাজিক সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। এখানেও তাই ঘটেছে। শ্রমিকের কর্মনিরাপত্তা বা বিত্তহীনের জীবনরক্ষা আমাদের অকাম্য নয়, কিন্তু সুনির্দিস্ট সামাজিক নীতির অভাব এগুলিকে উৎপাদনের জন্যে আংশিকভাবে পরিবর্জনীয় করেছে।

নাগরিক হিসেবে আমার প্রশ্ন এই যে, যেখানে বিবিধ লক্ষ্যের মধ্যে টানা-পোড়েন শুধু সম্ভব নয় অনিবার্য, সেখানে আমরা কিভাবে মনস্থির করব। বর্তমান ক্ষেত্রে, উৎপাদনের সর্বাগ্রগণ্যতা আমরা কতদূর মেনে নেব এবং সেই অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ করব।

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক ও সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম এই যে রাজস্ব সংগ্রহের খরচা সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণের চেয়ে বেশী, সে-রাজস্ব

প্রয়োগসাপেক্ষ হলেও প্রয়োগের অযোগ্য। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ-নিয়ম ফলপ্রসূ হওয়া উচিত। উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে যে উপায়ই আমরা কার্যকরী করিনা কেন, কার্যকারণ সূত্র মিলিয়ে আমাদের দেখতে হবে তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (যেহেতু সামাজিকও শেষ বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক ফলদ্যোতক) মূল্য বর্ধিত উৎপাদনের মূল্যের চেয়ে বেশী কিনা। এটা কোনো জটিল ব্যাপার নয়। উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে আমরা যদি এমন ব্যবস্থা করি যে উৎপাদনেরই মান বা পরিমাণ শেষ পর্যন্ত হ্রাস পায়, তাহলে সে-ব্যবস্থা স্পষ্টত অচল।

কিন্তু জটিলতা আসছে ওই 'শেষ পর্যন্ত' কথাটাতে। শেষ পর্যন্ত মানে কোন্ পর্যন্ত? কোনও একটা ব্যবস্থার ফলাফল ভবিষ্যতের কোন্ বছর পর্যন্ত হিসেব করব? আমার মতে এটা ভীষণ কোনও শক্ত হিসেব নয়। টাকাপয়সার হিসেব করার সময় শুধু অর্থনীতিকরা নয় ব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ প্রাপ্যের একটা অংশ বাদ দিয়ে ধরেন; যত বেশী দেরী তত বেশী বাদ। মোটা সুদের কথা ভাবলে এটা বুদ্ধিমানেরই হিসেব। কিন্তু ক্ষতির ক্ষেত্রে ঠিক উলটো: সেটা বাড়ে চক্রবৃদ্ধি হারে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, অনাস্থা, এসব শুরু হলে 'আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে, অথচ চতুর্বর্গ ফল গো।' অর্থাৎ অনন্ত ভবিষ্যতের কথা না ভাবলেও চলবে; ক্ষতির অংশটা যদি প্রমাণ সাইজের হয়, লাভ-ক্ষতির সমীকরণ কয়েক বছরের মধ্যেই ঘটে যাবে। তারপরে ক্ষতিই বেশী।

পুরনো উদাহরণটাই আবার নেওয়া যাক। কারখানার বা খনির উৎপাদকতা আজ আমাদের কাছে এত বড় বলে মনে হচ্ছে যে নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাতে আমরা ঢিলে দিতে পর্যন্ত রাজি হতে পারি। চোখের সামনেই যে লক্ষ্যটা আছে, সেটাই সব চেয়ে বড় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। উৎপাদনের খতিয়ানে হয়ত সত্যিই দেখা গেল কয়েক শো টন খনিজ বা কয়েক হাজার যন্ত্র অতিরিক্ত। কিন্তু এই বছরটা পেরিয়ে যেই আমরা সামনের কয়েকবছরের পরিসংখ্যান আন্দাজ করার চেষ্টা করব, অমনি দেখব খরচের খাতায় ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনার হার এবং সেইসঙ্গে বেশীমাত্রায় আপত্তি ও অসন্তোষ, সন্দেহ ও প্রতিবাদ, সংঘর্ষ ও ধর্মঘট। অর্থাৎ

উৎপাদনে মুহুর্মুহু বিঘ্ন। লাভ কমবে, ক্ষতি দ্রুত বাড়বে। প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের কীর্তি মুছে গিয়ে তখন উত্তরকালের সর্বনাশটাই প্রকট হবে।

হয়ত এই হিসেবে গাণিতিক পরিচ্ছন্নতা নেই। টাকা-পয়সার উৎপাদনের হিসেব সহজ; তত সহজ নয় কাটা হাতের বা কাটা মাথার মূল্যায়ন। আরো শক্ত অশান্তির হিসেব, সন্দিগ্ধ লোকের ওপর কর্তৃত্ব করার ঝঞ্ঝাটের হিসেব, বিষিয়ে-যাওয়া কাজের আবহাওয়ার হিসেব। কিন্তু হিসেব কঠিন বলেই কোনো ঘটনার অস্তিত্ব অসত্য হয়ে যায় না। আজকের লাভের অঙ্কটা সহজে পরিমেয় বলে তার জোরে ভবিষ্যতের অসংখ্য অপরিমেয় ক্ষতি ডেকে আনা অযৌক্তিক ও অবোধ। বর্তমানের অতিমূল্যায়নের আরেক নাম অপরিনামদর্শিতা।

উনিশশো ছিয়াত্তরের ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ইতিহাসে অনন্য নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন বাড়ানোর অদম্য চেষ্টা করা হয়েছে। কখনো মানুষ ঠিক করেছে, কখনো বা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু একটা শিক্ষা আমরা ইতিহাসের বিবিধ অধ্যায় থেকে সহজেই অনুধাবন করতে পারি: উৎপাদনবৃদ্ধি একটা বহুমুখী, দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম। সে সংগ্রাম সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে বুদ্ধিতে ও বিচক্ষণতায়। কিন্তু একযুগের উদ্যম এক সপ্তাহে সঙ্কুচিত করা অসম্ভব, এমন কি এক মাসেও। সেধরণের নাটকীয় প্রচেষ্টার সমাপ্তি নৈরাশ্যে, বিবাদে, সামাজিক বিপর্যয়ে। সামাজিক উৎপাদকতা বহু উপাদানে গড়ে ওঠে: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অনুশীলন, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, সমবেত প্রচেষ্টা। এগুলি মূল উপাদান; কাজেই রাতারাতি এগুলো পাল্টানো সম্ভব নয়, শুধু সম্ভব ভোল পাল্টানো।

হ্যাঁ, আমাদের বিশেষ প্রয়োজন উৎপাদনের। কিন্তু হঠকারী উৎসাহে যদি আমরা ক্ষণস্থায়ী, অদূরদর্শী উপায়ে উৎপাদন বাড়াতে যাই, অযৌক্তিক সামাজিক মূল্যে শস্য, সার বা ইস্পাত তৈরী করতে যাই, আমাদের লক্ষ্য সর্বদাই আমাদের প্রতারণা করবে। যাঁরা আজ উৎপাদন সম্পর্কে চিন্তিত, বা অন্তত সরব, তাঁদের কর্তব্য 'কঠিন শ্রম'-এর পুনরাবৃত্তির অতিরিক্ত বিশ্লেষণ-প্রয়াস।

সেই শিরঃসাধনে আমাদের মুক্তি। অগভীর বহুভাষণে নৈব নৈব চ॥

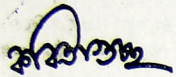

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের—'কফিন কিংবা সুটকেশ' নামকরণেই ধরে রেখেছিলেন এক বিপন্ন সময়ের স্মৃতি, সন্ত্রাসময় দিনরাত্রির অভিজ্ঞান, '৭০-৭১ এর ক্লিষ্ট বিপর্যস্ত বাংলাদেশের বিষণ্ণ-কোমল স্থিরচিত্র, যখন স্বপ্নবিলাসী যৌবনের কাছে খোলা ছিল একটিমাত্র পথ—কফিন কিংবা সুটকেশ : মৃত্যুদণ্ড-আমন্ত্রণ অথবা নির্বাসন। বেদনার ও বিক্ষোভের, স্বপ্নের ও প্রতীক্ষার, দুশ্চিন্তার ও দুঃসময়ের, ভালোবাসার ও গ্লানির, অপ্রেমের ও বিস্ফোরণের, স্বপ্নহীনতার ও রক্তপাতের তীব্র, জ্যান্ত কিছু ছবি বুদ্ধদেব আনায়াসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কফিন কিংবা সুটকেশ-এর পাতায় পাতায় :

(ক) "… … … এই অদ্ভুত সময়
যখন কফিন কিংবা সুটকেশ যে-কোনও একটা বেছে নিতে
বলা হয়েছে তোমাকে।"
(তৈরী হও)

(খ) … … … শেষ নয়
আরো তীব্র ভাবে ফেটে পড়ার আগে শুধু স্তব্ধ হয়ে আছে

বেদনাময় হাজার মানুষের বহুকালের জমাট-বাঁধা
অপর্যাপ্ত রক্ত"
(মৃত আশুকে)

(গ) "মুখচোরা লাজুক ভাইটি
হঠাৎ গেছে গ্রামে
চোখে তার শানানো নীল স্বপ্ন
সে কি ফিরে আসবে কখনো
মা ভাবেন সারারাত বসে।"
(স্বপ্ন, স্বপ্ন)

(ঘ) "ফুটপাথে এবং বাসস্টাণ্ডের কাছে কথা বলছে চিন্তিত মানুষ"
(এই রাত)

(ঙ) "ভালোবাসার রঙীন চিঠি সকাল থেকে
কিশোরীর হাতে ঘুরছে, দিশেহারা কিশোর
পাইপগান হাতে দমবন্ধ করে বসে আছে ভাঙা গ্যারেজের পাশে
ছুটছে মটোর ছুটছে পুলিশভ্যান"
(এপ্রিল '৭১)

'গভীর এরিয়েলে'-এর উন্মুখ, অস্থির, দিক-সন্ধানী কিশোর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে এসে কী করে এমন প্রাজ্ঞ, গভীর, সময়সচেতন, শান্ত এবং সর্বোপরি, প্রখর ব্যক্তিত্বময় হয়ে উঠলো ভাবতে বিস্ময় লাগে! এমন নয় যে, বুদ্ধদেব সরব সরোষ সুলভ তির্যক ভঙ্গিতে উচ্চকণ্ঠ, মুখ্যত কবিতারই ভাষা তাঁর, অত্যন্ত সংযত তাঁর তুলির আঁচড়, দুটি-একটি তাৎপর্যময় রেখায় তুলে ধরেছেন একটি গোটা সময়কে: সমসময়ের প্রতি দুর্বার মমতা তাঁর কবিতায় শুধু যোগ করেছে একটি নতুন মাত্রা, সমসাময়িক বহু কবির ভিড়ে তাঁকে চিহ্নিত করে দিয়েছে স্পষ্ট, সাহসী আলাদা, একজন হিসেবে।

বুদ্ধদেবের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই চিত্রময়তা। স্বচ্ছন্দ, সপ্রতিভ, গতিময় ভাষায় সুররিয়ালিস্ট ভঙ্গিতে আঁকা ছবিগুলি টাটকা, তেজী, অনায়াস। এলোমেলো নয়, অন্তর্গূঢ় কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা। 'কফিন কিংবা সুটকেশের'ই আরেকটি পর্যায়ে ছিল 'ব্যক্তিগত শান্ত অভিমানী'

কিছু প্রেমের কবিতা, একই রকম স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল কিছু ছবি, কিছু সরল সত্যময় স্বীকারোক্তি—

(ক) "তার ভালোবাসা ছাড়া আমার মদ খাওয়া মিথ্যা
তার ক্ষমা ছাড়া আমার গদ্য লেখা মিথ্যা"

(একদিন)

(খ) "এখন আমার ঠিক ভয় নয়, অপরাধবোধ নয়
শীত, বড় শীত লাগে বাহুর প্রান্তিকে"

(সর্ত কিছু নেই)

(গ) "সারারাত বাজি পুড়বে, সিল্কের পেটিকোট পরে সারারাত
হাসতে হাসতে চ্যান্সেলারের ঘামাচি মেরে দেবে চ্যান্সেলারের স্ত্রী
লাল ত্রিকোণ চিবিয়ে খেয়ে মার্চ করে এগিয়ে আসবে
মানুষের বাচ্চারা, তারা গান গাইবে ইন্টারন্যাশানাল,
তুমি তখনো শুয়েই আছো, শুয়ে আছে বুকের ওপর
মুহ্যমান হাত, কার কথা মনে পড়ছে তোমার…"

(ভোর হয়েছে তবু)

এই শৃঙ্খলাবদ্ধ, গভীর, পারম্পর্যময় কণ্ঠস্বরটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে ধাক্কা দেয় পাঠককে, কোনো সন্দেহ নেই।

যে কোনও জীবন্ত কবির লক্ষণই হল, নিজেকে ছাপিয়ে উঠে নতুনতর পথ ও শব্দের সন্ধান। বুদ্ধদেব এ-কথা জানেন। জানেন বলেই "খাঁটি মানুষ" তাঁর কবিতায় হয়ে ওঠে একজন 'খাঁটি কবি, একবার বিষণ্ণতার মধ্যে যাঁর মনে পড়ে "কোথায় গিয়েছে সেই শব্দগুলি যারা এতকাল ধরে তোমাকে মানুষ করে তুলেছে"। পরমুহূর্তেই নিজেই জেনে যান তার উত্তর, সেই অনিবার্যতাকে—"সেই শব্দগুলি এখন অনেক দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাড়া খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে একে একে। অদ্ভুত নতুন সব শব্দ ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরে ধরেছে তাদের।"

এই নতুন শব্দ বুদ্ধদেবের নতুন কবিতার সম্পদ। তাঁর বিষয় এখন আরো নতুন পথে শিকড় নামিয়ে দিয়েছে। তিনি এখন দেখতে পান : "ভয়ংকর এক বিস্ফোরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর ভোর বেলা" (ভোর

বেলা), "হাজার ঘৃণার ভারে/জলে উঠছে ভেসে উঠছে সময় (আজ সময়)" সুতরাং তাঁর সমস্যা : "কী করে আর সহজ ভাবে আগের কথা বলি (আগের কথা)।" স্পষ্টতই সেই সব রচনার প্রতি তাঁর ঘৃণা যা ক্লিশে, যা "তালুতে নিয়ে দোলালেও বোঝা যায় না কোন সাল, কোন হাওয়া", তিনি প্রায়-বিপন্ন কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠেন : "সময় এসেছে আজ অনেক মুখোশ থেকে টান মেরে মুখগুলি মুখের পায়ের নীচে লুটিয়ে দেবার" (বনে)। 'চোখের মণির রক্তে' যাঁর চিবুক ভিজে ওঠে, তাঁকেই মানায় ক্লীব, সময়ের কাঁটা-ঘোরানো রচনার প্রতি এই ঘৃণা। একশো বছর পরের জীবনে বরং তাঁর আস্থা প্রসারিত হয়—"ফিরে আসবো আবার, সব সময় হাঁ করে থাকা আজকের আমরা/কালো বস্তাপচা এই পৃথিবী/তখনো সেই মহাকাব্যের ভেতরে/শুধু আরো অনেক পৃথিবীর ভেতর জেগে উঠেছে প্রাণ/যারা আমাদেরই মত নোংরা, ঠাণ্ডা, যারা স্বপ্ন দেখে ব্যাঙের জীবন/লাফ দিয়ে চলেছে হাজার হাজার মহাকাশের দিকে (জীবন)।" কিংবা "দেখ, স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে এখন , এগিয়ে চলেছে/দ্রুত পিঁপড়ের সারি পুঁতির মতন সেই পৃথিবীর কোণে/সেই কোণ ডাক দেয় আমাদের, চলো আরো নীচে নেমে যাই"। (চলো যাই)

কোনো বিশেষ মতাদর্শ নয়, জীবনবোধই এই রচনাবলীর প্রত্যক্ষ প্রেরণা, সময়ের প্রতি নিবিড় মমতারই প্রতিবিম্ব এই ভাবনা—বুদ্ধদেবের সাম্প্রতিক রচনাকে দীপ্ত, উজ্জীবিত করে রেখেছে।

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত বুদ্ধদেবের ইতস্তত রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল রচনা 'মাগুর মাছ'। এই বিষয় যে কবিতা হতে পারে, জানা ছিল না, এই অনুভব এভাবে যে সংক্রামিত করে দেওয়া যায়, জানা ছিল না ; বিষয় ও অনুভব এই ভাবে মিলে মিশে এমন শরীরী হয়ে উঠতে পারে, সত্যিই জানা ছিল না। "রান্না ঘরের কোনায় নোংরা নালার পাশে ছোট্ট এক ডেকচির ভেতর" সারারাত সাঁতার কাটে মাগুর মাছ, তাদের চোখ জুড়ে স্বপ্ন, "সারারাত যাদের দুঃখরা বুদ্‌বুদ হয়ে ভেসে ওঠে জলের ওপর" তারপর ভোরবেলা শান্ত সুন্দর বৌ-এর হাতে "চকচকে মোলায়েম শরীর থেকে স্বপ্নরা ছিটকে বেড়িয়ে আসে একে-একে" সারা সকাল সারা দুপুর ভরে-

যাওয়া মাগুর মাছের গন্ধময় বাড়িতে রাত্রি নামে—তখন বৌটি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে সাঁতার কাটার 'শীতল নীল দূর-বয়সের দীঘির ভেতর'—আর তক্ষুনি হঠাৎ-হাওয়ায় খুলে-যাওয়া রান্না ঘরের দরজা, স্বপ্নের মাগুর মাছের সামনে পিছনে তাদের স্বপ্ন, অদ্ভুত শিস দিতে-দিতে সারারাত এ-ঘর ও-ঘর করা মাগুর মাছের এক আশ্চর্য, অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ছবি তুলে ধরেছেন বুদ্ধদেব তাঁর এই কবিতায়। এই কবিতাটি, শুধু এই একমাত্র কবিতাটি লিখেই বুদ্ধদেব অক্লেশে চাইতে পারেন একটি 'রাজপ্রাসাদ' কি 'পনটিয়াক গাড়ি।'

নিচের সাতটি সজীব কবিতাতেও বুদ্ধদেব তার উজ্জ্বল স্ফুরণ বজায় রেখেছেন।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর সাতটি কবিতা

ঢুকে পড়েছে

ইঁদুরের পেছনে ছুটতে থাকে বেড়াল
বেড়ালের পেছনে ছুটতে থাকে কুকুর
কুকুরের পেছনে
ছুটতে ছুটতে, চেন হাতে
ধপ্ করে বসে পড়ে মানুষ। দূরে
শান্ত, নীল একটা ঘরের মধ্যে
ফুটতে থাকে কেটলি, ফুটফুটে
সবুজ ডাইনিং-টেবিলে ফুটে ওঠে
কাপ, ডিশ,
চামচ নাড়তে নাড়তে গান গায় মানুষী,
তারপর, যখন ফুরিয়ে যায় গান, ঝরে যায়
কাপ, ডিশ
মানুষী হা-হা করে দৌড়ে যায় ছাদে

দূর থেকে দেখতে পায়,—কুকুরের পেছনে
ছুটছে বেড়াল, বেড়ালের পেছনে ছুটছে ইঁদুর
আর তার মানুষ, ছুটতে ছুটতে
ঢুকে পড়ছে
আশ্চর্য
এক ইঁদুরের গর্তে!

শেষ মিনি

চচ্চড় করে বাড়ছে ঘাস। আঙুল থেকেও বড় হয়ে যাচ্ছে নখ।
চচ্চড় করছে পেছনের দিনগুলো, অর্থাৎ অতীত। ফাঁকা রাস্তা
কালো রাস্তা সোজা রাস্তা বাঁকা রাস্তা। ছুটে আসছে কালো টায়ার।
বৃষ্টি। ঝমঝম করছে আকাশ। পরস্পরের দিকে থুতু ছিটোতে ছিটোতে
মৃত অনুপমবাবুর ছেলেরা ফিরে আসছে উকিল নিরুপম বাবুর
বাড়ি থেকে। কত দেরী, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধর? দেরী আছে!
মুখ বদলানোর জন্য মুখ এগিয়ে যাচ্ছে ঘাসের ভেতর,
নখের ডগায়, মুখ ছিড়ে খুঁড়ে খেয়ে চলেছে অতীত। আছে,
আছে দশটা পাঁচটা, চোয়া ঢেকুর ও রোঁয়া ওঠা মমির মহিলা।
ধোয়া তুলসীপাতার মেয়ে। হাতছানি। চোখে চোখ।
হারানোর নেই কোন কিছু। বলবার নেই কোন কিছু।
জমা পড়েছে লণ্ড্রী, ইলেকট্রিক, টেলিফোন, ট্রাঙ্ককল বিল।
দম দেওয়া শেষ হয়েছে কয়েক লক্ষ ঘড়িতে।
অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে রাবারের নল ঢুকে পড়েছে নাকের ভেতর।
ঘেন্নায় বেরিয়ে আসছে বাইরে। আঁকপাক করছে নাক,
ফুলে উঠছে পাটা। দম ফুরিয়ে আসছে কয়েকলক্ষ ঘড়ির। আসছে,
মাটি ফুঁড়ে ছুটে আসছে ফাঁকা মিনি। উড়ে যাচ্ছে
মেঘের ভেতর দিয়ে। অভিযোগ নেই, অভিযোগ করার উপায় নেই।
কেন দাঁড়িয়ে থাকা, কিসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, কতক্ষণের জন্য

দাঁড়িয়ে থাকা ? গর গর করছে পেট। গরগর করছে আকাশ।
বমি করছেন আকাশ-দেবতা। ভেসে চলেছে যা ভাসার ;
তার ভেতর ডুবে যাচ্ছে রাত্রি।

মানুষ

কিছু বলবে ? বসে আছো ঠায় একটি বছর একটি চেয়ারে।
তেঁতো, বিরক্ত হয়ে কাঠের চেয়ার কাঠ হয়ে উড়ে গেল গাছে।
কিছু বলবে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?
পাখি এসে বিষ্ঠা ফেলে যায়,
কাঠঠোক্রা খুঁটে খায় কান, শেষে কাঠ ভেবে নিয়ে যায়
করাত কলের আশে পাশে।
কিছু বলবে ?
কেশে ওঠে হাজার হাজার কাঠ, হেসে ওঠে কাঠের ভেতরে।

আমরা

একদিন নিশ্চয়ই আমরা বলতে পারবো
আমাদের কথা,
একদিন আমাদের চোখের সামনে থেকে
উড়ে যাবে
অদ্ভুত সেই পর্দা
যা চোখের পাতার চেয়েও ভারী হয়ে
ঝুলে রয়েছে চোখের মণির ওপর,
একদিন নিশ্চয়ই
আমরা ঝুকে দাঁড়াবো আপনাদের সামনে,
জানাবো
কি সাংঘাতিক ঘটনাবহুল ছিল জীবন, জানাবো

কি অত্যাশ্চর্য টানা-পোড়েনের মধ্যে
আজো কাজ করে যাচ্ছি আমরা ;
যখন হাসবো, দেখবেন
দাঁতের ভেতর জমে রয়েছে মাটি, যখন
খুলবো চোখ
মণি বেরিয়ে আসবে—যেন মাটির গুলি,
ভয় দেখানোর জন্য
যখন এগিয়ে নিয়ে যাবো আঙুল
নখের ভেতর থেকে খসে পড়বে মাটি,
পায়ের তলায়
আমরা বানিয়েছি আশ্চর্য মাটির ঘর,
আমরা মাটির মানুষ
এবং কোন কিছুর জন্যই
দায়ী করা চলে না আমাদের।

সেই নারী

কবিতার ওপর ঝুঁকে পড়েছে এক নারী।
পেনের ছুঁচলো মুখ দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে
এক-একটা অক্ষর
দূরে, সাদা কাগজের বাইরে। কবির শরীর
মুহুর্মুহু কুঁকড়ে উঠছে, তার মাথার আগুনে
মশারির চার কোনে জলছে আগুন। নারী
তার ভেতর ছুঁড়ে দিচ্ছে কবির ব্যক্তিগত সংগ্রহের
বই, রেকর্ড, খাতাপত্র। জলছে লাখ লাখ শব্দ,
জলছে লাখ লাখ ভাঁজ করা সুর। দপ-দপ করে
আগুন জলছে চারদিকে।
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের ফুলে ওঠা পেটে

হাত রেখে

হো-হো করে হেসে উঠছে নারী। সে জানে
ছাইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে
একজন পুরুষ,
যাকে সে স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে অনেকদিন,
যার মুখের আদলে তিল তিল করে বেড়ে উঠছে
ফোলা পেটের ভেতর অপেক্ষা করছে, তার সুখ।

হাড়

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ধূসর মেঘ, আজ অনেকদিন পরে আবার
তারা গলে যাবার, তারা ঝরে পড়ার
শব্দ শোনা যাচ্ছে, পৃথিবী
তেমনই আছে তো? নাকি এসেছে নতুন হিমযুগ?
তুমি কি টের পেয়েছো সাঁ-সাঁ করে বইছে হাড়ের ভেতর হাওয়া?
আজ আবার মনে পড়লো আমাদের চামড়া ও মাংসের কথা,
আমরা চিরকালই এমন হাড়হদ্দ ছিলাম না, আমরা চিরকালই
আমাদের হাড়ের ছেলেকে, যে জন্মেছে আমি যখন ঠুকেছিলাম হাড়
তোমার নড়বড়ে হাড়ের ওপর, রাখতাম না হাড় খাইয়ে। আজ তাকে
বলেছি স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্ন স্বপ্ন, সত্যিই স্বপ্ন দেখছে সে—
হাড় নেই আর, গজিয়েছে মেদ, আর হাঁ করা মুখের মধ্যে
ছুটে আসছে পাঁউরুটি, সাঁ-সাঁ করে তারা ঝরে পড়ার, তারা গলে যাবার
শব্দ শোনা যাচ্ছে,উড়ে চলেছেধূসর মেঘ হাড়ের ভেতর, মাটির ওপরের পৃথিবী
তেমনই আছে তো, নাকি এসেছে হিমযুগ?
শুয়ে থাকো চুপচাপ, মড়িতে মাড়ি চেপে সহ্য কর সব, যখন বিন্দুবিন্দু জল
ফুটে বেরুচ্ছে হাড়ের ওপর,
যখন হাড়ের হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছি আষ্টেপৃষ্ঠে তোমার হাড়ের গলা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে অত্যন্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাল ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরেই ইংলণ্ডে এই চিন্তা অনেক স্তরেই সমর্থন লাভ করেছিল যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, দেওয়া উচিত। এবং ভারতে পর পর অনেকগুলি ঘটনা ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত করে তুলেছিল : আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন, নৌ বিদ্রোহ প্রভৃতি কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। ইংলণ্ডে তখন শ্রমিক দলের শাসন। এবং এই দলের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন ভারত শাসন আর অতঃপর লাভজনক নয়। নিজেদের স্বার্থেই ভারতের সংগে একটা মীমাংসায় আসা দরকার, তা না-হলে ভারতের ক্রমবর্ধমান বাজার থেকে তাঁদের চিরতরে বিদায় নিতে হবে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের এই বোধোদয় হওয়ার ফলেই লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ, এবং তাঁর হাতে অবারিত ক্ষমতা প্রদান : খণ্ড খণ্ড করেই হোক, অথবা দেশ দু'ভাগ করেই হোক, ভারতকে স্বাধীনতা দিতেই হবে। একথা শুনতে সকলেরই আজ উদ্ভট মনে হতে পারে যে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকার তার হাত গুটিয়ে নিতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন ; ল্যারী কলিন্স এবং ডোমিনিক লেপিয়ে-র সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ 'ফ্রীডম অ্যাট, মিডনাইট' সেই সব ঘটনার এক সরস বিবরণ।

এই গ্রন্থটির প্রধান চরিত্র দুটি। লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। এবং মহাত্মা গান্ধী। মাউন্টব্যাটেনকে এই গ্রন্থে আঁকা হয়েছে দক্ষ, মানবিক মূল্যবোধ-আশ্রয়ী ও চিন্তাশীল এক মানুষ হিসেবে। যাঁর জন্ম, যাঁর মানসিক গঠন, যাঁর পরিবেশ প্রধানতই রাজতান্ত্রিক—যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের পতন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, যিনি ব্রিটিশ রাজপরিবারের অত্যন্ত নিকট আত্মীয়—তাঁকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের শেষ বিদায়ের পালায় অংশ নিতে হয়েছে। এবং সে কাজ এটলী মন্ত্রীসভার নির্দেশে যথাযথ তিনি সম্পন্ন করেছেন।

দেশবিভাগের দায়িত্ব যদিও ব্রিটিশ সরকারের ওপর দেওয়া হয়, কিন্তু এই গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হবে, সে দায়িত্ব পুরোপুরি আমাদেরই। কারণ মুসলীম লীগ কোনো সময়ে তাঁর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী শিথিল করে নি।

Missing Page(s)

তেমনি ভারতীয় রাষ্ট্রনেতারাও চেয়েছিলেন যেভাবেই হোক, ক্ষমতা যেন তাঁদের হাতে আসে। কিন্তু এই বিষয়ে একমাত্র মতান্তর ছিল মহাত্মা গান্ধীর। তিনি চাননি দেশ ভাগ হোক। ধর্মের ভিত্তিতে দুটি রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। তাঁর মতে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক দুর্যোগে দেশবিভাগ ছিল এক অবান্তর সমাধান।

সেই সমস্ত দিন আমরা পার হয়ে এসেছি। ভারত যদিও রাষ্ট্র হিসেবে স্থিতিলাভ করেছে; কিন্তু পাকিস্তানের আবার অঙ্গহানি ঘটেছে। আজকের দিনে গান্ধিজীর চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত ঘটনাসমূহের পুনর্বিচার ও মূল্যায়ন অবশ্যই প্রয়োজন।

আলোচ্যগ্রন্থটি পড়তে ভালো লাগে। নানা ঘটনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার জন্য যেটুকু ক্ষমতার প্রয়োজন, তা গ্রন্থকারদের আছে। লেখাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে বাস্তব অথবা কাল্পনিক নানা ঘটনাকে কিভাবে পরিবেশন করতে হয়, তা তাঁদের অধিগত। যেমন গান্ধিজীর জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সংযম তাঁর সমস্ত জীবনের আদর্শ একদিন রাত্রে কথঞ্চিৎ দৈহিক উত্তেজনায় কেমন করে বিধ্বস্ত হতে চলেছিল, স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ এবং সেই মতবাদ তাঁর সাত্বিক লক্ষ্যে নিয়ে যাবার পথে তার অনুশীলন ও প্রয়াস সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ এবং এই মতবাদকে কর্মক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে তাঁর অনলস, প্রায় দুঃসাধ্য প্রয়াস ইত্যাদি অত্যন্ত সুন্দরভাবে রচনা করেছেন লেখক দুজন।

বিশেষ করে শেষ পরিচ্ছদটির একটি অংশ অত্যন্ত সুন্দর। এবং এই অংশ থেকে গান্ধিজী সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেনের গভীর নজর আর এক উদাহরণ পাওয়া যায়। উপাসনার প্রাঙ্গণ থেকে মহাত্মা গান্ধীর মৃতদেহ বিড়লা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। শায়িত গান্ধিজীর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে মাউন্টব্যাটেনের মনে হল, এত শান্তি সম্ভবত এই মানুষটির মুখের প্রতিভাসে আর কখনো দেখা যায়নি। কে একজন তার হাতে একগুচ্ছ গোলাপের পাপড়ি এনে দিল, মুক্তহাতে তিনি ধীরে ধীরে সেগুলি অর্পণ করলেন এই বিশাল মানুষের উদ্দেশ্যে, যাকে কিছু আগেই মনে হয়েছিল তাঁর কাছে এক ছোট শান্ত বিধ্বস্ত পাখীর মত।

গান্ধিজী সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেনের অপরিসীম শ্রদ্ধা এই গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট। তাই মাউন্টব্যাটেন গভীর দুঃখের সঙ্গে মনে করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে যে-লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য গান্ধিজী মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক হানাহানির সমাপ্তি ঘটল। শহরে, গঞ্জে এবং গ্রামে যে দাঙ্গা জনজীবনকে সমস্তরকম সুস্থ চেতনার বিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, তার অবসান ঘটল এই মহাক্ষতির পর।

এই মূল আখ্যানটুকু বাদ দিলে আরো কিছু কিছু সরস অংশের সংযোজনা গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছে। যেমন বিভিন্ন রাজা মহারাজার নানারকম খেয়াল, বছর বছর নতুন নতুন সুন্দরী সমাবেশে হারেমের সৌষ্ঠব বর্ধন, প্রজসাধারণকে বছরে একবার সাক্ষাতের সুযোগ দেবার বিচিত্র প্রথা, বাগানবাড়ির শীততাপ নিয়ন্ত্রণের অপূর্ব কৌশল, কারো কারো সারল্যের এবং খেলনা-রেলগাড়ি প্রীতি ইত্যাদি।

লাহোর শহরের বর্ণনাটিও চমৎকার। তখনকার সমাজ জীবন, বিশেষ করে ধনী গোষ্ঠীর অবসর যাপনের চিত্রটি নিঃসন্দেহে আজকের দিনে অনেকেরই কৌতূহলের সঞ্চার করবে। এবং এসকল বর্ণনায় দুই গ্রন্থকারই সাধ্যমত তত্ত্বনির্ভর বলে দাবী করেছেন।

কিন্তু গ্রন্থটির সব থেকে ত্রুটি রাজনৈতিক ঘটনা সমূহের তথ্য নির্ণয়ে ভ্রান্তি। কারণ, তথ্যের উৎস সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব নয়। এঁদের তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে একদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং অন্যদিকে এটলী, ওয়াভেল, গান্ধিজী, পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের মধ্যে আলোচনার বিবরণ থেকে। লেখকরা দাবী করেছেন এই বিবরণ তাঁরা শুনেছেন মাউন্টব্যাটেনের কাছে। দুর্ভাগ্যবশত এঁদের কেউই এখন জীবিত নন যে এই দাবীর সত্যাসত্য বিচার করা সম্ভব। যদি ধরে নেওয়া হয় গ্রন্থকারদের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাৎকালীন যে আলোচনা হয়, এবং মাউন্টব্যাটেন সে সময় যে-যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলেন সেগুলি এ গ্রন্থে অবিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তবু সংশয় থাকে, মাউন্টব্যাটেন সাহেব সে সময় কতখানি স্মৃতিনির্ভর অথবা কতখানি দলিলনির্ভর ছিলেন। একমাত্র

ইণ্ডিয়া অফিসের সরকারী নথীপত্র প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থকারদের বক্তব্যের সত্যাসত্য কিছুটা হয়ত নির্ণয় সম্ভব। তবে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত (অর্থাৎ ভারতের ডোমিনিয়ন প্রাপ্তির সময় থেকে লুই মাউন্টব্যাটেনের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত) সময়ের ব্রিটিশ সরকারের সরকারী নথিপত্রের সন্ধান হয়ত কখনই পাওয়া যাবে না।

গ্রন্থের কিছু কিছু ঘটনা সন্দেহের উদ্রেক করে যেমন ২৪শে মার্চ, ১৯৪৭-এর ভাইসরয় প্রাসাদের বাথরুমে লুকিয়ে লেডি মাউন্টব্যাটেনের টাটকা মুরগীর মাংস খাওয়া (এই মাংস বাড়ির রেয়ারারা এনে দিয়েছিল তাঁর দুই টেরিয়ারের জন্য)।

তারপর পেশোয়ারে মুসলমান জনতার বিরাট সমাবেশের সামনে যখন এসে লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেন হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। সেই সময় তার পোশাকের রঙ নিয়ে দ্বিমত আছে। ক্যাম্পবেল জনসনের মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি কিন্তু বলেছিলেন, মাউন্টব্যাটেনের গায়ে ছিল খাকি বুশ শার্ট। কিন্তু ফ্রীডম এ্যাট মিডনাইট গ্রন্থের গ্রন্থকারেরা লিখেছেন বুশ শার্টের রং ছিল সবুজ-ইসলামের পবিত্র রং, এবং তাই দেখেই উত্তাল জনতা নাকি শান্ত হয়েছিলেন। এগুলো হয়ত তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যেও সন্দেহ থাকার প্রচুর সম্ভাবনা। কিছু কিছু ঘটনা আছে যা কতখানি তথ্যভিত্তিক অথবা কতখানি কল্পনা প্রসূত তা নির্ণয় করা কখনই সম্ভব হবেনা। এই তথ্য বিকৃতির আরো কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সম্প্রতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ এ. কে মজুমদার। কলিন ও লেপিয়ের-এর মতে পাকিস্তানী হানাদারেরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আগমনের আগে শ্রীনগর পৌঁছুত পারেনি, তার কারণ তারা মুজঃফরবাদে লুট তরাজ ও বারামুল্লায় নান-ধর্ষণেই সময় নষ্ট করেছিল। ডঃ মজুমদার বলেছেন লুঠ-তরাজ ও ধর্ষণে পাকিস্তান হানাদারেরা সময় নষ্ট করেছে সত্যি, কিন্তু শ্রীনগর দখল করতে না পারার সেইটেই কারণ ছিলনা, তাঁর মতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধই তাদের এই ব্যর্থতার কারণ।

১৯৪৭ সালের আগস্টমাসে কলকাতায় গান্ধিজীর আগমন সম্পর্কে এই গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অনুরোধেই তিনি এই সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেছিলেন। আসল ঘটনাটি ভিন্ন, কলকাতার মুসলমান সম্প্রদায়ের আন্তরিক অনুরোধই ছিল দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় গান্ধিজীর আগমনের কারণ।

গ্রন্থকারদের গবেষণা বিশ্লেষণ সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের কারণ থেকেই যায়। যেমন। জাহাঙ্গীর সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য তারা লিখেছেন: ভারতে জাহাংগীর ছিলেন চতুর্থ এবং শেষ মুঘল রাজা।

ফ্রীডম অ্যাট মিডনাইট সত্য ও কাল্পনিক নানা ঘটনায় বিধৃত এক উপাখ্যান। আর লেখক দুজন ঘটনার প্রথাগত সূত্রাশ্রয়ী বিশ্লেষণে অপরাগ।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

[Freedom At midnight : Larry Collins and Dominique lapierre. Vikas Publishing House Pvt. Limited, New Delhi, 1976, Price : Rs. 45].

সত্যজিতের-চলচ্চিত্র ভাবনা

সত্যজিৎ রায় বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ, সন্দেশ, মোহনবাগান ইত্যাদির মতো জাতীয় সম্পত্তি। এখন আর কবিটবিরা জগৎসভায় গর্ব্ব করার কবিতা লেখেন না তাই সত্যজিত রায় সম্বন্ধে কবিতা এখনো লেখা হয় নি। কিছুদিন আগে হ'লে নিশ্চয় লেখা হ'ত। ভারতীয় সিনেমা জগতে বাংলা সিনেমার যে আধিপত্য সেটা প্রায় একলা সত্যজিতের দান। বিদেশে ভারতীয় ছবির সম্মান তো পুরাপুরিই সত্যজিতের একক কৃতিত্ব। কলকাতায় যেসব বিদেশীরা আসেন তাঁরা দুটো জিনিষ জানতে চান [১] অন্ধকূপ হত্যা কোথায় হয়েছিল? (কলকাতার দুর্গাম) [২] সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কি দেখা হ'তে পারে? (কলকাতার সুনাম)। সত্যজিতের প্রতিদ্বন্দ্বীরা (আছ নাকি?) কষ্ট পেলেও এটা মোটামুটি অনস্বীকার্য্য যে সত্যজিৎ রায় একাই একটি প্রতিষ্ঠান।

সুতরাং তাঁর একটি বই তাও আবার সিনেমা সম্বন্ধে বই প্রকাশিত হ'লে যে একটা হৈ চৈ হ'বে এটাই প্রত্যাশিত। হ'লোও তাই। **Our Films, Their Films** এক রবিবার সকালে প্রচুর হৈ চৈ করে প্রকাশ হ'লো। সারা কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল হাজির হ'লেন একাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহে। সেদিনের অনুষ্ঠানে যাঁরা নেমন্তন্ন পান নি তাঁরা লজ্জায় সিঁটিয়ে রইলেন, ক্রুদ্ধ হ'লেন, যাঁরা পেয়েছিল তাঁদের ওপর। পুস্তক প্রকাশক এবং ফেডারেশান অব ফিলম্ সোসাইটিস্ ইন ইণ্ডিয়া অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি রাখেন নি। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর অত্যন্ত সরস এবং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে একটি মনোরম ভাষণ দিলেন। তাতে নন্দনতত্ত্ব, ছবির মহিমা, সব সম্বন্ধে গভীর আলোচনা ছিল। সবশেষে ছিল দীর্ঘ সংস্কৃত স্তোত্র। অতি মনোহারী ভাষণ। তারপর জাতীয় অধ্যাপক আচার্য্য সুনীতিকুমারের ভাষণ। ইনিও স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গীতে প্রত্যাশিত

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। প্রেক্ষাগৃহে ক্ষণে ক্ষণে দমফাটা হাসি শোনা যেতে লাগলো। সত্যজিৎকে এত প্রাণ খোলা হাসি হাসতে প্রকাশ্যে খুব বেশী দেখা যায় নি। এরপর সত্যজিৎ আবারো তাঁর ছোট্ট ভাষণে আমাদের মুগ্ধ করলেন।

এই সভায় বসে আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম আর কোনো বাঙালী লেখকের কখনো এই সৌভাগ্য হয়েছে কিনা। রবীন্দ্রনাথের সব বই প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়েছে। বঙ্কিম শরৎ সকলেরই একদশা। বোধহয় মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা নিয়ে কিছুটা হৈ চৈ হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও এইরকম ঝেঁটিয়ে লোকজন আসেন নি এবং উদ্যোক্তারাও বলেন নি এখানে রবাহুতেরা ভীড় করেছেন। এদিক দিয়ে সত্যজিৎ নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনখানি থান ইঁটের মতো সমালোচনা বেরিয়ে গেছে। লিখেছেন সত্যজিতের বন্ধু চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সত্যজিতের পরেই যে চিত্র পরিচালকের নাম করা যায় সেই মৃণাল সেন এবং ষ্টেটস্-ম্যানের নামহীন সমালোচক। এর পর সত্যজিতের বই নিয়ে আলোচনা করার সাহস খুব বেশী লোকের থাকে না। যেটুকু থাকে সেটুকুও উবে যেতে বাধ্য যদি লিখতে বসে সত্যজিতের নিজের উক্তি স্মরণ করা যায় "ভাল বই পড়া, ভালো ছবির প্রদর্শনীতে যাওয়া বা গানের আসরে বসে ভাল গান শোনা—এ সবের তাগিদ তাঁরাই বোধ করেন যাঁরা ভাল ছবি, ভালো বই বা ভাল গানের কদর করেন বা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিনেমার ব্যাপারে দেখি যাঁরা 'সংগম' দেখেছেন তাঁরাই আবার লা দোলচে ভিতা-তেও উঁকি দিচ্ছেন। এতে অবিশ্যি বলবার কিছু নেই—কারণ পকেটে পাঁচসিকা পয়সা এবং হাতে ঘণ্টা তিনেক সময় থাকলে যে-কেউ যে-কোন ছবিই দেখতে পারেন" (বিষয় চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৪৩), তবে কিনা আমি নেহাৎ দু কান কাটা তাই বইটা নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রথমেই বলে রাখি বইটি আমার বেশ ভাল লেগেছে পড়তে। বইটিতে কোনো ধারাবাহিক বর্ণনা নেই—কোনো সিনেমা নিয়ে থিসিস নেই। দীর্ঘ ২৫ বছরের ওপর সময় ধরে তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ বা বিভিন্ন সভায় যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন তারই সংকলন এটি। সংকলনের প্রথমে

সত্যজিৎ নূতন একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন। এরই মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটি শিল্পীর মন। একটি সিনেমা তৈরী করতে কি কি লাগে তার হিসাব। সত্যজিতের মন কিভাবে কাজ করে তার একটা হদিশ। কোনো কোনো সময়ে মজার ঘটনা (জয়সলমীরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার) কোনো কোনো সময়ে করুণ অভিজ্ঞতা (জলসাঘর ছবি তৈয়ারী করার সময় কোনো দুর্ঘটনার অসাধারণ বিবরণ)। স্বচ্ছ তরতরে ভাষা ফল্গুধারার মতো বহমান রসবোধ এবং তাঁর শিল্পের প্রতি তদ্‌গত নিষ্ঠা বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। যেদিন সত্যজিৎ রায়কে লোকে চিনতো অসাধারণ বই-এর মলাট স্রষ্টা এবং সুকুমার রায়ের পুত্র বলে সেদিনের লেখা একটি প্রবন্ধ **What is wrong with Indian Films?** (রচনা ১৯৪৮) আজকে আমরা যখন পরের ইতিহাস জেনে পড়ি তখন অবাক লাগে। সেদিন তিনি বলেছিলেন **"What our cinema needs above everything else is a style 'an idiom' a sort of iconography of cinema, which would be uniquely and recognisably Indian"** ১৯৪৮ সালে ভারতীয় ছবির কাছে যে দাবী তাঁর ছিল সে দাবী তিনি মিটিয়েছেন। আজ ভাল ভারতীয় ছবি আর সত্যজিতের ছবি প্রায় সমার্থক।

সত্যজিৎ রায় ভারতে ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছেন। একদিক দিয়ে ভাল ছবি তৈরী করবার চেষ্টা যেমন করেছেন তেমনি চেষ্টা করেছেন বোদ্ধা দর্শক তৈরী করবার। কিছুটা নিশ্চয় কাজ হয়েছে। সত্যজিতের যে ফিল্মটি আমার সবচেয়ে ভাল লাগে (পথের পাঁচালী সবসময় আলাদা ভাবে বিচার হবে) সেই পরশপাথর যখন প্রথম মুক্তি পেয়েছিল তখন কলকাতার দর্শক সেটি ভালভাবে গ্রহণ করে নি। পরে প্রায় দুদশক বাদে আবার যখন ছবিটি পুনরায় ফিরে এল দর্শক সমাজ তখন সাদরে গ্রহণ করলো। এ দিকটা যেমন সত্যি তেমনি আরো একটা দুঃখের দিকও সত্যি। আজ ফিল্মসমালোচকদের মধ্যে একধরনের পণ্ডিত হাজির হয়েছেন যাঁরা গোরুর হাম্বাধ্বনির মধ্যে আত্মার ব্যাকুলতা লক্ষ করেন, যে কোন ব্যাপারে গদার ত্রুফো ব্রেসঁ এনে ফেলেন। এঁরা দুর্ধর্ষ রকমের আধুনিক আর ভয়ংকর প্রগতিবাদী, সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের প্রতি এঁদের

অসীম অবজ্ঞা। যে বইটি সাড়ে তিন দিনের বেশী চলে না সে বইটি ছাড়া অন্য বইকে ভাল বই বলতে এঁদের বিশেষ দ্বিধা। এ সম্বন্ধে সত্যজিৎ বলেন "All in all, I am less worried about the film makers aiming too high—which is not a bad thing—than aiming the wrong way. I am not sure I am happy about the minority audience Syndrome either. This seems suspiciously like a defensive manoeuvere on the past of the new film makers. Why not aim wider? I do not know of a single film maker who has been dismayed by a wide acceptance of his work." আমার মনে হয় পণ্ডিতরা এর পর একটু সাবধান হবেন।

একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। আজ ভারতের কোণে কোণে ফিল্ম সোসাইটি ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা শহরেই কয়েক হাজার সভ্য আছে বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাবগুলির। একদিকে যেমন এইসব আধা পণ্ডিতরা আছেন অন্যদিকে তেমনি Uncensured ছবি দেখার জন্য (তার কারণ একটাই—নগ্নদৃশ্য দেখার আকাঙ্খা) জোটেন আরেক দল। তবু কিছু লোক আছেন যাঁরা প্রায় সন্ন্যাসীর একাগ্রতা নিয়ে এই আন্দোলনের জন্য খাটছেন। আশা করবো এই দুই দলের চাপ থেকে ফিল্ম ক্লাবগুলি মুক্তি পাবে।

Our Films Their Films বইটিতে বিদেশী ছবির অংশটি বেশ বড়। এমন কি যেখানে সত্যজিৎ ভারতীয় ছবি নিয়ে আলোচনা করছেন সেখানেও বিদেশী চিত্র পরিচালকরা মাঝে মাঝেই এসে হাজির হয়েছেন। আসলে সত্যজিৎ সত্যিকারের অর্থে আন্তর্জাতিক চিত্র পরিচালক। এক জায়গায় উনি 'এশিয়া এক' এই দাবী খারিজ করেছেন। সত্যজিৎ জাপানী ছবি আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন "At the turn of the century, a Japanese nobleman aesthetic called count Okakura came to India to spread the gospel that Asia is one ; linked he said, by the same guiding principles of art & philosophy. Very well, But the fact remains that the Far East is content with only five notes in music while we in India have to have the full chromatic

scale, with some quarter tones thrown in (I, personally, have to have my Bach and Mozart too). And if I love chinese painting and Japanese Woodcuts, it is not at the expense of my admiration for Ce'zanne and Piero della Francesca. And consider eating habits ; the Chinese do not round off their meals with dessert, while we follow a Sanskrit proverb which says "All meals must end with sweets".

সত্যজিতের জবানীতেই আমরা জানতে পারি কেমন ভাবে অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সত্যজিৎ যাঁদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁরা বেশীর ভাগ ইউরোপের চিত্র পরিচালক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন চিত্র পরিচালকও সত্যজিৎকে আকৃষ্ট করেছেন হয়তো প্রভাবিতও করেছেন। বইটা পড়তে পড়তে আমার বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে সত্যজিৎ যদিও বাংলা ছবি তুলেই বিশ্বজোড়া নাম কিনেছেন তবু সত্যজিৎ আসলে একজন সাহেব। বাঙালীর বোধহয় ভাগ্যই এরকম। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন থেকে সুরু করে বহু সাহেব বাঙালী জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত ছাড়া অন্য ব্যাপারে ভারতীয় প্রভাব সত্যজিতের বাংলা বই 'বিষয় চলচ্চিত্র' এবং আলোচ্য বইটিতে সত্যজিতের আগের ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে একটি কথাও নেই (প্রথম প্রবন্ধটি ছাড়া যার উল্লেখ আগে করেছি) তাঁর সমসাময়িকদের সম্বন্ধেও খুব কম কথা আছে। বাঙালী দুজন চিত্র পরিচালকের কথা বলেছেন কথা প্রসঙ্গে। এঁরা হলেন মৃণাল সেন আর ঋত্বিক ঘটক। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন বইটির যা কিছু সাফল্য তা ভারতীয় ছবির চিরাচরিত সাফল্যের চাবিকাঠির সূত্র ধরেই। ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে কিছু ভাল কথা আছে, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে ঋত্বিকের রসবোধ (**humour**) ছিল না। অন্যত্র তিনি ঋত্বিককে খাঁটি বাঙালী বলে অভিহিত করেছেন শুনেছি। সত্যজিৎ অবশ্যই জানেন যে তাঁর পক্ষে খাঁটি বাঙালী বা খাঁটি ভারতীয় হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি ছিলেন বলেই হয়তো বাংলাদেশের হৃদয়ের খবর এত সহজে ধরতে পেরেছিলেন।

সত্যজিৎও তাই হয়তো প্রথম প্রচেষ্টাতেই পথের পাঁচালীর মতো একটা খাঁটি বাঙলা বই আমাদের উপহার দিয়েছিলেন।

চিত্র পরিচালকের কাজ লেখা নয়। তবু সত্যজিৎ যে ছবির সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার কথা আমাদের লিখে জানান এ আমাদের সৌভাগ্য। আশা করবো তিনি ভবিষ্যতেও আমাদের এ রসে বঞ্চিত করবেন না।

বইটি সুমুদ্রিত। সেদিক দিয়ে প্রকাশক ধন্যবাদ পেতে পারবেন। বইটি বিদেশে আদৃত হবে নিশ্চয়, সুতরাং বিদেশের নিরিখে বইটির ৬০ টাকা দাম বেশী নয়। কিন্তু সত্যজিতের অগণিত গুণগ্রাহীর কাছে ৬০ টাকা দাম ধারণার বাইরে। মারি সিটনের সত্যজিতের ওপর বইটির একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। আশা করবো অবিলম্বে সতজিতের নিজের বই-এর একটি সুলভ সংস্করণ বেরোবে।

[Our films, Their films—Satyajit Ray. Orient Longman Limited Rs 60·00]

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

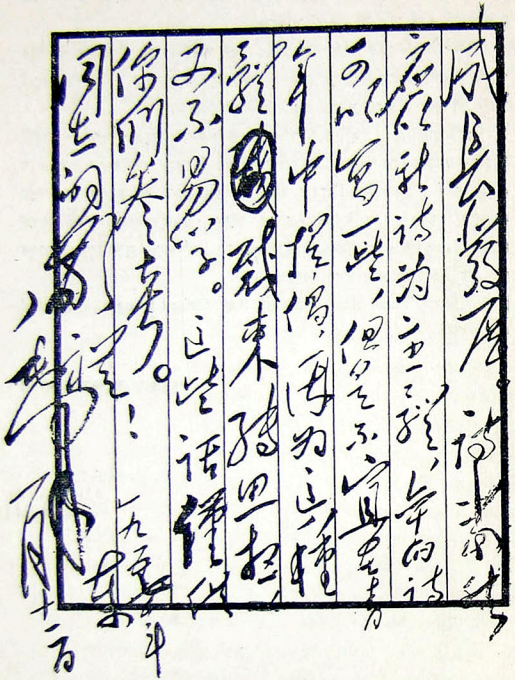

[illegible] 诗当然应以新诗为主体，旧诗可以写一些，但是不宜在青年中提倡，因为这种体裁束缚思想，又不易学。这些话仅供你们参考。同志的敬礼！

毛泽东
一九五七年一月十二日

"কবিতা" সম্পাদকমণ্ডলীকে মাও সে তুং লিখিত চিঠির (অংশ)
মূল হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মাও সে তুং

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

[মাও সে তুং এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। একটি ন্যুব্জ, নেশাপ্রিয়, নৃপতিশাসিত দেশকে তিনি প্রায় অলৌকিক রাজনৈতিক প্রতিভায় পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছেন। নেতা শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে অনুষঙ্গ আমাদের মনে আসে তার এমন সার্থক স্ফুরণ পৃথিবীর খুব কম নেতার চরিত্রে ও ব্যক্তিজীবনে দেখা গেছে। অতি সাধারণ ছিল তার জীবনযাত্রা। বস্তুতপক্ষে চীনের যে কোনো মানুষের চেয়েও কম ছিল তার নিজস্ব প্রয়োজনের দাবী। একটি অতিপুরানো ইঁট-কাঠ বের করা বাড়িতে তিনি থাকতেন। নিতান্ত বাধ্য না হলে জীর্ণ পরিধেয় পাল্টাতেন না। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ছাড়া ধোপদুরস্ত বা দামী জামাকাপড় তিনি খুব কমই পড়েছেন। জনতাকে যে উপদেশ দিয়েছেন, আগে সবসময়ই নিজে তার যোগ্য হয়ে উঠেছেন। একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ছাড়া এমন সরল সাধারণ বাহুল্য-বর্জিত জীবনযাপন প্রণালী এ শতাব্দীতে আর কোনো নেতার ছিল বলে আমাদের জানা নেই।

তাঁর অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে অনেক সময়ই আমরা একমত হতে পারিনি। কিছু কিছু কাজে ভারতবাসী হিসাবে আমরা বিষণ্ণ হয়েছি হয়তো। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা। তিনি যে একজন গণ্য কবিও ছিলেন, সাহিত্যপ্রীতি ও গ্রন্থমণীষায় ছিলেন বিশেষভাবে মাননীয়, এটা আজ আর আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি বলতেন, "রাজনীতি রাজনীতিই, সাহিত্য সাহিত্য। এককে অপরের পরিপূরক করে তুলতে গেলে সাহিত্য স্লোগানে রূপান্তরিত হয়, শিল্প থাকেনা আর।" তিনি বলতেন "সমকালীন কবিতার ভাষা হওয়া উচিত সর্বতোভাবে আধুনিক। যে ভাষা সকলে বুঝবে, যুবমানসকে উদ্দীপিত করবে, কবিতার ভাষা ও রচনাশৈলী তেমনি হওয়া উচিত। তাঁর নিচের চিঠিটি এ-কারণেই বিশেষভাবে মূল্যবান।]

১৯৫৭ সালের ১২ই জানুয়ারী মাও সে তুং একটি চিঠি লেখেন "কবিতা" নামক নতুন একটি পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে। কাগজটি মাও-এর কবিতাগুচ্ছ প্রথম সংখ্যায় ছাপে এবং মাও-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অচিরেই একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। প্রথম সংখ্যায় মাও ১৮টি কবিতার একটি গুচ্ছ "কবিতা"য় ছাপতে দেন। তাদের কয়েকটি অবশ্য ইতস্তত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেইসব কাগজে বেশ কিছু মুদ্রনপ্রমাদও ছিল। তাই মাও সে তুং সেইসব কবিতার শুদ্ধপাঠ এবং আরো কিছু নতুন কবিতা পাঠিয়েছিলেন 'কবিতা'র সম্পাদকমণ্ডলীকে। এ-সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিবেদন: "এ সংখ্যায় আমরা চেয়ারম্যান মাও-এর আঠারোটি কবিতা প্রকাশ করলাম। প্রাচীন ধ্রুপদীশৈলীতে কবিতাগুলি রচিত। মাও-এর চিঠিটি, যাতে কবিতা বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত, তাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হল। এই চিঠি ও কবিতাগুচ্ছ আমাদের তুমুল প্রেরণা জোগাবে। চেয়ারম্যান মাও শুধুমাত্র একজন মহান বিপ্লবীই নন, তিনি একজন বড় কবিও। সমস্ত পাঠকবৃন্দের তরফ থেকে আমরা তাকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই। এই আঠারোটি কবিতার অনেক গুলিই নতুন ও কিছুকালের মধ্যে লেখা এবং আগে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। কয়েকটি মাত্র পত্রান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল বা ভিন্নভাবে গ্রন্থিত

হয়ে প্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ঘটেছিল মুদ্রণপ্রমাদ। এখানে আমরা যে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করলাম, মাও নিজে তা মিলিয়ে দেখে দিয়েছেন। এই প্রথম সংখ্যায় আমাদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিটিও আমরা প্রকাশ করলাম। এই চিঠিতে তিনি আধুনিক কবিতা ও ধ্রুপদী প্রাচীন আঙ্গিকের কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মতামত প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এটা যারা কবিতা লেখেন, বা পড়েন, উভয়ের কাছেই প্রয়োজনীয় মনে হবে"।

মাও সে তুং-এর চিঠি:

জানুয়ারী ১২,১৯৫৭

প্রিয় কে-চিয়া এবং সহকর্মীবৃন্দ,

আপনাদের সহৃদয় চিঠি কিছুদিন আগে পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত। আপনাদের অনুরোধমত এই সঙ্গে আমার সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবিতার আলাদা আলাদা অনুলিপি পাঠালাম। পত্রান্তরে প্রকাশিত যে আটটি কবিতা সংগ্রহ করে আপনারা আমাকে পাঠিয়েছিলেন তা নিয়ে সর্বমোট আঠারোটি কবিতা হলো। কবিতগুলি সম্পর্কে আপনাদের মতামত ও আলোচনা পেলে অনুগৃহীত বোধ করবো।

এর আগে কখনই আমি আমার কবিতাকে তেমনভাবে লোকগোচরে আনার চেষ্টা করিনি। আমার ধারণা আমার রচনানীতি প্রাচীন। ভয় ছিল, এই প্রাচীনশৈলীর কবিতাগুলি হয়তো অনভিপ্রেত প্রভাবই সৃষ্টি করবে যুবমানসে। তাছাড়া কবিতা হিসাবেও হয়তো তেমন কিছু নয় লেখাগুলি, অসাধারণত্বও নেই। তবু যদি আপনাদের মনে হয়ে থাকে রচনাগুলি প্রকাশ যোগ্য, তাহলে অন্যান্য কাগজে প্রথম প্রকাশের সময় যে সব মুদ্রন-প্রমাদ ছিল সেগুলি শুধরে নিয়ে, অবশ্যই লেখাগুলি ছাপবেন।

এটা ভাবতে ভাল লাগছে যে নতুন মাসিক "কবিতা" পত্রিকাটি আপনাদের পরিচালনায় অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হবে। আশা করবো পত্রিকাটি সুন্দর হবে ও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। এটা তো ঠিকই সমকালীন কবিতা আধুনিক আঙ্গিকেই রচিত হওয়া উচিত। অবশ্য ধ্রুপদী

রীতিতেও কিছু কিছু কবিতা রচনা করা আমাদের কর্তব্য। তবু তরুণ লেখকদের এই প্রাচীন আঙ্গিকে রচনাকর্মে উৎসাহ না দেওয়াই উচিত। কেননা এই পদ্ধতি তাদের সজীব মানসিকতাকে গণ্ডীবদ্ধ করতে পারে। তাছাড়া এই ধ্রুপদী রচনা-পদ্ধতি বিশেষ আয়াসসাধ্যও। আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত মতামই আপনাদের জানালাম।

ভ্রাত্রীয় অভিনন্দনসহ
মাও সে তুং

মাও সে তুং-এর শেষ কবিতা / সাওশানে ফেরা

[২৫ শে জুন ১৯৫৯-এ বত্রিশ বছর পরে আমি সাও শানে ফিরে আসি : মাও সে তুং]

সময় তোমাকে আমার অভিসম্পাত ; চলে গেছে বহু দিন
আমার ঘর ছেড়ে আসার দিন
বত্রিশ বছর আগের দিনের
ক্ষীণ স্মৃতির স্বপ্ন
লাল নিশান কাঁধে চাষীভাইরা সেদিন
তাদের বল্লম উঁচু করে ধরেছিল
আর শাসকের কালো হাতের মুঠিতে
ছিল উদ্যত চাবুক,
তবু মহান আবেগ আত্মনিবেদনের ভাষায় হয়েছিল উচ্চারিত
সূর্য চন্দ্রকেও বলা হয়েছিল
তাঁরা নতুন উদ্ভাসে জ্বলে উঠুক আকাশে।

আজ আনন্দিত আমি মুগ্ধ চোখে দেখি সোনালী ধানের ঢেউ
দেখি সজীব উদ্যম
দেখি সূর্যাস্তের ম্লান আচ্ছন্ন আলোর ভিতরে
যারা বীর তারা ফিরে আসছে ঘরে।

কবিতা অনুবাদ : পার্থ রাহা

কবি নজরুল ইসলাম

আরতি সেন

কবি নজরুল পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যু নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে যে তিক্ততা সৃষ্টি হ'লো, পৃথিবীর ইতিহাসে তা তুলনারহিত। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ ভারতে আনার জন্য যে আগ্রহ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল তার ভগ্নাংশব্যয়ে আমরা জীবিত নজরুলকে এ দেশে ফিরিয়ে আনতে পারতাম অনেক আগেই। কবি বাংলাদেশে যাওয়ার পরে সংবাদপত্রের কোনে দু-এক ছত্র মলিন সংবাদপংক্তি লক্ষ্য করা ছাড়া আমরা আর কিছুই করিনি। এই আশ্চর্য উদাসীনতা, এই প্রায় ক্ষমার অযোগ্য কুন্তক সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের হেয় করেছে।

মরনোত্তর নজরুলকে নিয়ে দুঃখ, ক্রোধ, স্মৃতি উদ্‌যাপনের যে প্রদর্শনী সুরু হয়েছে তা কিছুটা স্বাভাবিক বলে আমরাও কোনো আপত্তি করবো না। বাঙ্গালীর চরিত্রই এই। তবে আশা করবো মৃত্তিকার নিম্নশায়িত দেহ নিয়ে অফলপ্রসূ বিতণ্ডা অবিলম্বে বন্ধ রেখে তাঁর পুণ্যস্মৃতি রক্ষার কোনো স্থায়ী বন্দোবস্ত হবে। তাঁর নামের রাস্তাতো অনেকদিন আগেই হয়েছে। নজরুলের দরাজ বুকের মতোই প্রশস্ত রাস্তা "নজরুল ইসলাম এ্যাভিন্যু" দিয়ে বিদেশীরা দমদম এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতায় আসতে আসতে ভাবেন এই নজরুল—কে ? ঐ পর্যন্তই !

আজ তাই সময় এসেছে কবি হিসাবে স্বাধীন রাজনৈতিক চেতনার পুনরুজ্জীবনের পুরোহিত হিসাবে, সর্বোপরি গীতিকার, সুরকার হিসাবে নজরুলের পুনর্মূল্যায়নের। আমরা তাঁর কবরে ফুল দিতে পারিনি, কিন্তু তাঁর গান গাইতে, তাঁর কবিতা আবৃত্তিতে কে আমাদের বাধা দেবে ? দেশভাগ হলেও নজরুলকে এতদিন ভাগ করা যায় নি ! ধর্ম আজ তাও করল।

নিচে নজরুলের একটি দুষ্প্রাপ্য চিঠি মুদ্রিত হলো। কথা ও লেখনী যুগপৎ বন্ধ হয়ে যাবার আগে এটি কবির শেষ চিঠিগুলির অন্যতম। চিঠিটি কবির বিশেষ প্রীতিভাজন জনাব সুফি জুলফিকার হায়দারকে লেখা :

প্রিয় হাইদর,

খোকাকে পাঠালাম, তুমি এখনই খোকার সাথে চলে এস। আমি **Blood pressure**-এ শয্যাগত। অতি কষ্টে চিঠি লিখছি। আমার বাড়ীতে অসুখ, ঋণ, পাওনাদারদের তাগাদা প্রভৃতি **worries**, সকাল থেকে রাত্রি অবধি খাটুনী। তারপর নবযুগের **worries** ৩/৪ মাস পর্যান্ত। এইসব কারণে আমার **nerves shattered** হয়ে গেছে। ৭ মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারীর মতো ৫/৬ ঘন্টা বসে থেকে ফিরে এসেছি। হিন্দু-মুসলিম **Equity**-র টাকা কারু বাবার সম্পত্তি নয়, বাঙলার বাঙালীর টাকা। আমি ভাল চিকিৎসা করাতে পারছি না। একমাত্র তুমিই আমার জন্য **sincerely appeal** করেছ সত্যিকার বন্ধু হয়ে। আমার হয়তো এই শেষ পত্র তোমাকে। একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু? কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে অতি কষ্টে দু একটা কথা বলতে পারি, বললে যন্ত্রণা সর্বশরীরে। হয়তো ফিরদৌসীর মত ঐ টাকা আমার জানাজার নমাজের দিন পাবো। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ করেছি আত্মীয়স্বজনকে,

হয়তো ভালই আছ।

তোমার নজরুল

১৭. ৭. ৪২

CALCUTTA IMPROVEMENT TRUST

offers fully developed land in Calcutta Corporation area with clear title for—

A) EMPLOYEES' HOUSING CO-OPERATIVE SOCIETIES

B) EXPANDING LOCAL COMMERCIAL FACILITIES, e. g.,

Banks, Commercial and Shopping Centres, Warehousing and Cold Storage, Cinemas and Theatre houses.

Construction of buildings on mutually approved designs in conformity with environmental and structural parameters of the Calcutta Corporation and snbject to relevant statutory constraints e. g., the Urban Land (Ceiling and Regulations) Act 1976, may be undertaken in select cases on an agency basis where such construction is on land purchased from the C.I.T.

For all details please contact :—

Sales Promotion Cell

CALCUTTA IMPROVEMENT TRUST
P-16, India Exchange Place Extn.,
Calcutta-700012

Telephone : 22-1032.

BIVAV

Special Autumn Number : July—September 1976 Vol I, No I

Declaration No 35/76. **Price Rs. 2.00**

For your requirements

HESSIAN, SACKING, CARPET BACKING,
COTTON BAGGING, FINE YARN, TWINE

Please Contact

THE NAIHATI JUTE MILLS COMPANY LTD.

Registered Office

7, Hare Street, Calcutta-700001

Grm : NAIJUMCO
Phone : 22-9901 (3 lines)
Telex : CALFLO CA-7013 & RAVI CA-2721
Mills : Hazinagar (24 Parganas)
Phone: Bhatpara 25
Kalyani 398